সত্তার লক্ষণ — সর্বাস্তিবাদ, দার্ষ্টান্তিক এবং সৌত্রান্তিক মতের পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনশাস্ত্রে এম.ফিল. উপাধিপ্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত

বর্ষ ঃ ২০১৮-২০১৯

স্মৃতা মুখার্জ্জী

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা ঃ **MPPH194003**

রেজিষ্ট্রেশন নং ঃ **119220 of 2012-2013**

মে, ২০১৯

Certified that the thesis entitled, "সত্তার লক্ষণ — সর্বাস্তিবাদ, দার্ষ্টান্তিক এবং সৌত্রান্তিক মতের পর্যালোচনা" submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar at Egra S.S.B. College thereby fulfilling the criteria for submission, as per M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Smrita Mukherjee

SMRITA MUKHERJEE
Name of the M.Phil Student
Roll No.001700903003
Registration No.119220 of 2012-13

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of SMRITA MUKHERJEE entitled "সত্তার লক্ষণ — সর্বাস্তিবাদ, দার্ষ্টান্তিক এবং সৌত্রান্তিক মতের পর্যালোচনা", is now ready for submission towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy of Jadavpur University.

P. Sarkar
Head 14/05/19
Department of Philosophy

Head
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Maitreyee Datta 14.5.19
Supervisor & Convener of RAC

Associate Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Madhumita Chattopadhyay
Member of RAC 14.5.19

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় ঃ **সত্তার লক্ষণ — সর্বাস্তিবাদ, দার্ষ্টান্তিক এবং সৌত্রান্তিক মতের পর্যালোচনা।**

এই প্রবন্ধ পত্রের সম্পূর্ণ আলোচনা এক বছরের সময়সীমায় আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা মৈত্রেয়ী দত্ত মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে থেকে সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি। তিনি তাঁর ব্যস্ততামুখর প্রতিটি দিনের মধ্যেও তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করেও আমাকে এই বিষয়ে পড়িয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন এবং সর্বদা জ্ঞানালোকিত দিগ্‌নির্দেশ করেছেন। এবং কী প্রক্রিয়ায় আমি আমার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবো, তার জন্য সকল প্রকার সদ্ উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাই তাঁর প্রতি আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রয়াস সরকার মহাশয়ের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। এর পাশাপাশি দর্শন বিভাগের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও আমি বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞ, তাঁরা বিভিন্ন পুস্তকের অনুসন্ধানে ও প্রাপ্তিতে ঐকান্তিকভাবে সহযোগিতা ও সাহায্য করেছেন। এছাড়াও আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ আমার বাবা ও মা যাদের একান্ত অনুপ্রেরণা ও পরিশ্রমের ফলে আমি আজ এতদূর পৌঁছোতে সক্ষম হয়েছি এবং যথাযথভাবে কার্যসম্পাদন করতে পেরেছি। সর্বোপরি আমার সহপাঠীরা ও বড় দাদা-দিদিরা যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছে, তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

(স্মৃতা মুখার্জী)
১৫ই মে, ২০১৯

দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা — ৩২

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১. ভূমিকা	১ — ৬
২. প্রথম অধ্যায় — সর্বাস্তিবাদে সত্তার লক্ষণ ও তার বিবর্তন	৭ — ২৪
৩. দ্বিতীয় অধ্যায় — দার্ষ্টান্তিক আচার্য ভদন্ত রামের দৃষ্টিতে সত্তার ধারণা	২৫ — ৩৪
৪. তৃতীয় অধ্যায় — আচার্য ধর্মকীর্তির মতে সত্তার লক্ষণ	৩৫ — ৫৬
৫. সিদ্ধান্ত	৫৭ — ৬২
৬. গ্রন্থপঞ্জী	৬৩ — ৬৪

ভূমিকা

গবেষণামূলক প্রবন্ধে আমার মূল আলোচ্য বিষয় হল বৌদ্ধদর্শনে সর্বাস্তিবাদ, ভদন্ত রাম এবং আচার্য ধর্মকীর্তির দৃষ্টিকোণ থেকে সত্তার লক্ষণ। ভূমিকা বা মুখবন্ধ হল সমগ্র প্রবন্ধের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ। সমগ্র গ্রন্থে বা প্রবন্ধের প্রতিপাদিত বিষয়টিই সারসংক্ষেপে ভূমিকায় ব্যক্ত করতে হয়। সুতরাং এই ভূমিকা অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকাংশের প্রতিপাদিত বিষয়টি পাঠককে আকৃষ্ট করে কোনো গ্রন্থপাঠে। তাই ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি।

সত্তার লক্ষণটি প্রধাণতঃ দর্শনের অধিবিদ্যারূপ যে শাখাটি আছে তার আলোচ্য বিষয়। দর্শনের অনেকগুলি শাখা আছে, যেমন — অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি। এর মধ্যে অধিবিদ্যাকে দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রাখলে খুব একটা অন্যায় করা হবে না। কারণ অধিবিদ্যা হল দর্শনের সেই শাখা যেখানে সত্তার স্বরূপ এবং প্রয়োজনীয় উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। যেখানে অন্যান্য বিজ্ঞান সত্তার কোনো একটি দিক বা বিভাগকে নির্বাচন করে নিয়ে সেই অংশের আবশ্যকীয় উপাদানের পর্যালোচনা করে অধিবিদ্যায় সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কোনো সত্তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয় না, সাধারণভাবে সত্তা বলতে কী বোঝায়, তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়।

অধিবিদ্যার একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল সত্তাতত্ত্ব। সত্তাতত্ত্বের মূল প্রশ্নগুলি হল — অস্তিত্ব বলতে কী বোঝায়? কোন্ কোন্ বস্তু অস্তিত্বশীল, কোন্ কোন্ বস্তু অস্তিত্বশীল নয় ইত্যাদি। সুতরাং সত্তার লক্ষণ কী, বা সত্তার বৈশিষ্ট্য কী? বা সৎ কাকে বলে? কোন বস্তু সৎ এবং কোন্‌টি সৎ নয়? সৎ হতে গেলে কি বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম থাকতে হবে? সৎ এবং অবভাসের মধ্যে পার্থক্য কি? ইত্যাদি সকল প্রশ্নগুলি অধিবিদ্যক প্রশ্ন। এবং দর্শনের সারই হল সত্য অনুসন্ধান। সুতরাং এইসকল প্রশ্নগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং মৌলিক। এছাড়াও অধিবিদ্যক সত্তার ওপরই জ্ঞানবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত। সেই চরম সত্তাকে জ্ঞান প্রকাশ করতে পারলেই জ্ঞান যথার্থ। সদ্‌বস্তুকে প্রকাশ করলেই জ্ঞান যথার্থ হয়।

সত্তার লক্ষণ কী হবে বা সদ্‌বস্তুর বৈশিষ্ট্য কী হবে, এই বিষয়ে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই একাধিক মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং সত্তার ধারণাটি কিরূপ হবে - দর্শনের জগতে এটি একটি বহুচর্চিত এবং বহু আলোচিত বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমি কেবলমাত্র বৌদ্ধ দর্শনের মূলতঃ সর্বাস্তিবাদ, ভদন্ত রাম ও আচার্য ধর্মকীর্তির দৃষ্টিকোণ থেকে সত্তার লক্ষণের বর্ণনা করতে উদ্যত হয়েছি।

পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটো, অ্যারিষ্টটলের মধ্যে সত্তার আলোচনাটি মুখ্যভাবে দেখা যায়। প্লেটোর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষের জগত সৎ-এর জগত নয়, তা হল নকল বা অনুলিপির বা অবভাসের জগত। সৎ বস্তু হল একমাত্র ধারণা, যার বৈশিষ্ট্য হল — নিত্য, শাশ্বত, চিরন্তন, অপরিবর্তিত এবং যা কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য। এবং ধারণা কেবল জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। প্লেটো এইভাবে সত্তার ও অসত্তার দুটি জগতের উল্লেখ করলেন। অন্যদিকে অ্যারিস্টটলের কাছে ধারণা ও বিশেষের সমন্বয়ে যে বিশিষ্ট বস্তু সেগুলি সদ্বস্তু বা দ্রব্য। পরবর্তীকালে অস্তিবাদী দার্শনিকদের নিকট পুনরায় জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার থেকে সত্তাতাত্ত্বিক আলোচনা মুখ্যরূপে দেখা দেয়।

যাইহোক, পাশাপাশি ভারতীয় দর্শনেও সত্তার ধারণা নিয়ে একাধিক মতবাদ দেখা যায়। যেমন — অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলা হয়, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত জগত ও জাগতিক সকল বিষয় মিথ্যারূপে গণ্য করা হয়। অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্কর সত্তাত্রৈবিধ্যবাদে বিশ্বাসী। তিনি তিনধরণের সত্তার স্তরভেদ স্বীকার করেন যথা প্রাতিভাসিক সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা এবং পারমার্থিক সত্তা। স্বাপ্ন অভিজ্ঞতা ও প্রমাজ্ঞানের বিষয়ের প্রতিভাসিক সত্তা আছে, ভ্রমাজ্ঞানের বিষয়ের ব্যবহারিক সত্তা আছে, আর ব্রহ্ম বা আত্মার পারমার্থিক সত্তা আছে। কিন্তু প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তা যেহেতু ত্রৈকালিক অবাধিত নয়, যেহেতু তা বাধিত হয়ে যায়, তাই পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলি মিথ্যা। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম যেহেতু - ত্রিকাল অবাধিত তাই তা পরমার্থ সৎ। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্ত মতে, ত্রৈকালিক অবাধিতত্ব হল পরমার্থ সৎ-এর বৈশিষ্ট্য।

অন্যদিকে, ন্যায়দর্শনের মূল লক্ষ্য হল অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মার মুক্তিলাভ সম্ভব। ন্যায়দর্শনে সৎ পদার্থ তাকেই বলে যার 'অস্তিরূপে

প্রতীতি' হয় তাই সৎ। সেই অর্থে ভাব এবং অভাব উভয় পদার্থই সৎ। কারণ 'ঘট আছে' এরূপ যেমন জ্ঞান হয় 'ঘটাভাব আছে' এরূপ অভাবেরও তেমনি জ্ঞান হয়। বিপরীতে আকাশকুসুম ও বন্ধ্যাপুত্রের 'অস্তিরূপে প্রতীতি' হয় না বলে তারা অসৎ।

সুতরাং উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে, সদ্ বস্তুর বৈশিষ্ট্য কী হবে — এ বিষয়কে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় দর্শনেই বিস্তারিত আলোচনা আছে।

যাইহোক, এখন মূল প্রবন্ধের বিষয়ে আসা যাক। আমার এম.ফিল. গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল — সত্তার লক্ষণ — সর্বাস্তিবাদ, দার্ষ্টান্তিক এবং সৌত্রান্তিক মতের পর্যালোচনা। বর্তমান প্রবন্ধে আমি আমার বক্তব্য বিষয়কে তিনটি অধ্যায় ও সিদ্ধান্তের মধ্যে বিভক্ত করেছি। গবেষণার এই ক্ষুদ্র পরিসরে এই স্বল্প প্রচেষ্টাকেই বাস্তবিক রূপ প্রদান করতে পেরেছি, আশা করছি ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও গভীর আলোচনা করতে সক্ষম হবো। নিম্নে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা হল।

গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আমার আলোচ্য বিষয় হল সর্বাস্তিবাদসম্মত সত্তার লক্ষণ ও তার বিবর্তনের যে ধারা বা ইতিহাস সেটিকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করা। এই প্রসঙ্গে কালের আলোচনাও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সর্বাস্তিবাদের অনন্যতা বা বিশেষত্ব হল তাঁদের মতানুসারে তিনটি কালেই বস্তু বা সংস্কৃত ধর্ম সৎ। তাঁরা বস্তুর ত্রিকাল অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাই তাঁরা দার্শনিক সমাজে সর্বাস্তিবাদী নামে পরিচিত। এই অধ্যায়ের প্রথমেই সংস্কৃত ধর্ম কীভাবে তিনকালে সৎ হয়, এই প্রসঙ্গে চারজন বিখ্যাত সর্বাস্তিবাদীগণ যেসকল মতবাদ প্রচার করেছেন, তার উল্লেখ করেছি। মহাবিভাষা গ্রন্থে এই চারটি মতবাদের উল্লেখ আছে। এই চারটি মতবাদ হল যথাক্রমে ভদন্ত ধর্মত্রাতের ভাবান্যথাত্ববাদ, আচার্য ঘোষকের লক্ষণান্যথাত্ববাদ, আচার্য বুদ্ধদেবের অন্যথান্যথিকত্ববাদ এবং আচার্য বসুমিত্রের অবস্থান্যথিকত্ববাদ। এই চারটি ত্রিকালসত্তার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে আচার্য বসুবন্ধু, বসুমিত্রের অবস্থান্যথিকত্ববাদকেই অধিক সমীচীন বলে মনে করেছেন। কারণ অন্যান্য মতবাদগুলির তুলনায় এই মতবাদটি অপেক্ষাকৃত কম দোষযুক্ত। ভাবান্যথাত্ববাদের বিরুদ্ধে সাধারণত পরিণামবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলি প্রযোজ্য হয়। যেহেতু ভাবান্যথাত্ববাদ অনেকাংশে পরিণামবাদের অনুরূপ। লক্ষণান্যথাত্ববাদ ও

অন্যথান্যথিকত্ববাদের বিরুদ্ধে অধ্বসাঙ্কর্য্যের আপত্তি দেখা যায়। অবস্থান্যথিকত্ববাদে অবস্থা বা কারিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনকালের সংস্কৃত ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। তবে বসুমিত্রের মতবাদটিও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কারণ, কারিত্রের ধারণা স্বীকার করেও অনেক বর্তমান বস্তুকেও বর্তমান বলে স্বীকার করা যাচ্ছে না যেমন — নিদ্রারত চক্ষু বা অন্ধকার দ্বারা প্রতিবন্ধকতাপ্রাপ্ত চক্ষু। কারণ উপরিউক্ত দুটি অবস্থার চক্ষু বর্তমানে থেকেও তাদের নিজ নিজ কার্যসম্পাদন করতে সমর্থ হচ্ছে না। ফলতঃ প্রকৃত কার্যোৎপাদনকে কারিত্র না বলে বসুমিত্র ফলদানপ্রতিগ্রহণকে কারিত্র বলে স্বীকার করলেন। কিন্তু বসুমিত্রের মতবাদটির বিরুদ্ধেও অতীত ধর্মের অধ্ব-বর্তমানতার (semi-presentness) আপত্তি ওঠায়, আচার্য সঙঘভদ্র কারিত্রের ধারণাটিকে পরিমার্জন ঘটালেন। তাঁর কাছে কারিত্র হল ফলাক্ষেপশক্তি বা ফলপ্রতিগ্রহণ। সঙঘভদ্রের ফলাক্ষেপশক্তি কোনো প্রকৃত কার্যোৎপাদনকে নির্দেশ করে না, বরং তা এক শক্তিকে নির্দেশ করে, যা কেবল বর্তমান কালেই থাকে। আচার্য সঙঘভদ্রের এরূপ বক্তব্যকে আচার্য শান্তরক্ষিত ধর্মকীর্তির সত্তার ধারণার সঙ্গে সদৃশ বলে মত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ শান্তরক্ষিত মনে করেন যে, সঙঘভদ্রের ফলাক্ষেপশক্তি ধর্মকীর্তির অর্থক্রিয়াশক্তি। যদিও, সঙঘভদ্র ফলাক্ষেপশক্তি স্বীকার করেও বস্তুর তিনকালে সত্তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু ধর্মকীর্তি বস্তুর একক্ষণে অস্তিত্ব স্বীকার করেন।প্রথম অধ্যায়ে এইসকল আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভদন্ত রামের অস্তিত্ব বিষয়ক মতবাদ, প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং গতি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। যদিও সত্তা সম্পর্কে সরাসরি সেখানে ভদন্ত রামের আলোচনা নেই, তবুও আমরা তার উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সত্তা বিষয়ে তার অভিমত যে সৌত্রান্তিক মতাবলম্বী তা বুঝতে পারি। আচার্য সঙঘভদ্রের আলোচনাটি দিয়ে প্রথম অধ্যায় শেষ করার পরেই আচার্য ধর্মকীর্তির আলোচনাটি করলে আলোচনাটি যথার্থ হত না। সেখানে ছেদ পড়ে যেত। কারণ, আচার্য সঙঘভদ্রের অনেক পরে আচার্য ধর্মকীর্তি এবং বসুবন্ধুর বক্তব্যকেও আমরা যথার্থ সৌত্রান্তিক বক্তব্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। যেহেতু তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন যোগাচার বিজ্ঞানবাদী। তিনি সর্বাস্তিবাদ মতকে খন্ডন করার জন্যই কেবল সৌত্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। যাইহোক ভদন্ত রাম হলেন বসুবন্ধুর পূর্বেকার একজন সৌত্রান্তিক। ভদন্ত রামের গুরু হলেন শ্রীলাত। শ্রীলাতকে দার্ষ্টান্তিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক রূপে গণ্য করা হয়। প্রথমেই এই

অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দার্ষ্টান্তিক ও সৌত্রান্তিক এক না ভিন্ন এইসকল মতামত আলোচনা করেছি এবং দার্ষ্টান্তিক শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ধারণ করেছি। এরপর ভদন্ত রামের প্রতীত্যসমুৎপাদ ও গতি বিষয়ক আলোচনায় দেখেছি যে, তিনি ক্ষণিকত্ববাদে বিশ্বাসী। তিনি গতি স্বীকার করেন না। একটি বিষয় যে স্থলে তার সত্তা প্রাপ্ত হয় সেই স্থলেই সে বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলতঃ ভদন্ত রাম যে প্রচ্ছন্নভাবে সৌত্রান্তিক মতে বিশ্বাসী তা বলাই যুক্তিসম্মত।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমি সৌত্রান্তিক আচার্যের অর্থক্রিয়াকারিত্বের আলোচনা করেছি। এই আলোচনাটি আমি আচার্য ধর্মকীর্তির মতানুসরণ করেই করেছি।প্রথমেই ধর্মকীর্তির যে দুটি গ্রন্থকে (প্রমাণবার্ত্তিক ও ন্যায়বিন্দু) অবলম্বন করে আলোচনা করেছি, সেই গ্রন্থ দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেছি। পরবর্তীকালে ধর্মকীর্তির সত্তার আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় আলোচনা করেছি। যেমন, প্রমাণের লক্ষণ, প্রত্যক্ষের স্বরূপ, প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য বিষয়, স্বলক্ষণের স্বরূপ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, প্রমাণ হতে গেলে তাকে অবিসংবাদক ও অনধিগত হতে হবে। অবিসংবাদকের অর্থ করতে গিয়ে প্রমাণবার্তিকে টীকাকার মনোরথ নন্দী বলেছেন — অর্থক্রিয়াস্থিতিঃ অবিসংবাদনম্। অর্থাৎ যে জ্ঞানে বস্তুর অর্থক্রিয়া প্রতিভাসিত হয় সেই জ্ঞানই প্রমাণ। অর্থাৎ যা সদ্‌বস্তুকে প্রকাশ করে সেই প্রকাশই কেবল অর্থের প্রাপক হয়। ফলতঃ সদবস্তুকে প্রকাশ করার মধ্যে প্রমাণের প্রমাণ যোগ্যতা নির্ভর করে আছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ধরণের অর্থক্রিয়াকারী বস্তুকে জ্ঞানে প্রকাশ করতে পারে বলে এই দুটি জ্ঞান প্রমাণ। কিন্তু প্রত্যক্ষে যেভাবে অর্থের অর্থক্রিয়াকারী রূপ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে অনুমানে সেটি হয় না। অনুমানে অনর্থকে অর্থরূপে অধ্যবসায় করা হয়। এইভাবে অনুমান অর্থের প্রাপক হয়। কিন্তু, প্রত্যক্ষেই স্বলক্ষণ ধরা পড়ে। অনুমানে স্বলক্ষণকে জানতে পারি না, সামান্য লক্ষণকে জানতে পারি। স্বলক্ষণই বস্তুর অসাধারণ বা অর্থক্রিয়াকারী রূপ। এই স্বলক্ষণই পরমার্থ সৎবস্তু। এই স্বলক্ষণ বস্তুর স্বভাব হল অর্থক্রিয়াসামর্থ্য। অর্থক্রিয়াসামর্থ্য কী? তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনোরথ নন্দী বলেছেন যা ইষ্ট উৎপাদন করতে পারে তাই অর্থক্রিয়া। অর্থাৎ যা কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে, তাই অর্থক্রিয়া। এরপর আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধে অর্থক্রিয়াকারিত্বের সাথে ক্ষণিকত্ববাদের সম্বন্ধ প্রদর্শন করেছি। এই প্রকারে আমরা ধর্মকীর্তির আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখলাম যে কীভাবে তার দর্শনে জ্ঞান বিদ্যা, অধিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। সিদ্ধান্তে উপনীত

হয়ে আমি দেখিয়েছি যে, আচার্য ধর্মকীর্তির মতবাদটিই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য। আচার্য ধর্মকীর্তির বিশেষত্ব হল সত্তার লক্ষণের দ্বারা তিনি ক্ষণিকত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলতঃ তিনি সত্তার লক্ষণকে একটি যৌক্তিক আকার প্রদান করেছেন, এবং সর্বাস্তিবাদের সমস্যাগুলি সিদ্ধান্তে আলোচনা করেছি। সর্বাস্তিবাদ যেহেতু যৌক্তিকভাবে অসম্ভব এবং তা অনুভবসিদ্ধও নয় তাই সর্বাস্তিবাদকে স্বীকার করা যায় না। সর্বাস্তিবাদ অযৌক্তিক এবং দোষমুক্ত হলেও তাদের মতবাদের গুরুত্বকে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ তাদের কালিক প্রকারভেদের মানদণ্ডরূপ যে কারিত্রের ধারণা তাই বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাসে ক্রমবিবর্তনের ফলে ধর্মকীর্তির সত্তার লক্ষণ অর্থক্রিয়াকারিত্বে একটি যৌক্তিক রূপ পায়।

প্রথম অধ্যায়

সর্বাস্তিবাদে সত্তার লক্ষণ ও তার বিবর্তন

গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আমার মূল আলোচ্য বিষয় হল সর্বাস্তিবাদীগণ কর্তৃক প্রদত্ত সত্তার লক্ষণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা। বৌদ্ধদর্শনে মূলতঃ চারটি সম্প্রদায় বর্তমান যথা বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার বা **বিজ্ঞানবাদ** এবং মাধ্যমিক বা **শূন্যবাদ**। এই চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈভাষিক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং মূল, কারণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের তত্ত্বগুলি এই বৈভাষিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত তত্ত্বগুলির আংশিক খণ্ডন ও গ্রহণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। সুতরাং সেই অর্থে বৈভাষিক দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিষয়টিকে স্মরণে রেখেই আমি আমার সত্তার আলোচনায় প্রথমেই বৈভাষিক মত বা সর্বাস্তিবাদ ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়েছি। সত্তার আলোচনাটিকে সম্পূর্ণতা প্রদান করতে হলে প্রথমে সত্তাসংক্রান্ত বৈভাষিক মতের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। সৌত্রান্তিক আচার্য ধর্মকীর্তির মতে সৎ বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব হল অর্থক্রিয়া সামর্থ্য বিশিষ্ট হওয়া। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে আচার্য ধর্মকীর্তি বলেছেন, "অর্থক্রিয়াসামর্থ্য লক্ষণত্বাদ্ বস্তুনঃ "১৫"[১]। সৌত্রান্তিক দর্শনের সত্তার বা সৎ বস্তুর এরূপ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য বৈভাষিক দর্শনে সত্তার লক্ষণ কারিত্রের ধারণার ক্রমোন্নতির ফলে সমুদ্ভাবিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য হল সত্তার লক্ষণের এই ক্রমবিবর্তনটিকে পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে আলোচনা করা।

বৈভাষিক দর্শনে সর্বাস্তিত্ববাদের প্রচার করা হয়। তাই সর্বাস্তিবাদের সত্তা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে, বৈভাষিক দর্শনের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। অর্থাৎ বৈভাষিকগণের দার্শনিক অবস্থান কী, তা জানা প্রয়োজন। বৈভাষিক দর্শনে সর্বাস্তিবাদের কথা বলা হয়। বৈভাষিকগণকে সর্বাস্তিবাদী বলার অন্যতম কারণ হল তারা পৃথিবী, জল প্রভৃতি বাহ্যবস্তু ও চিত্ত, চৈত্তাত্মক আভ্যন্তর বস্তুর, এই দ্বিবিধ প্রকার বস্তুর বা ধর্মের তিনকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালে) অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এবং তারা বস্তুবাদী। অর্থাৎ তারা বাহ্য ও আভ্যন্তর বস্তুর মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বৈভাষিকগণের সঙ্গে সৌত্রান্তিকগণের মূল

[১] সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ, ন্যায়বিন্দু, ২০০৭, ১১৫।

পার্থক্য হল তারা পদার্থের বা সংস্কৃত ধর্মের মনোনিরপেক্ষ বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাদের তিনকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত) অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই কারণে সৌত্রান্তিকগণ বস্তুবাদী হলেও তারা ক্ষণিকত্ববাদী (সদ্‌বস্তু মাত্রই তা ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী)। ক্ষণিকত্ববাদের সঙ্গে তাদের সত্তাসংক্রান্ত বক্তব্য অর্থক্রিয়াকারিত্বের যৌক্তিক সঙ্গতি বর্তমান। কিন্তু বৈভাষিকগণের কাছে সংস্কৃত ধর্মের ত্রিকাল সত্তা ব্যাখ্যা করা একটি কঠিন কাজ, তবুও তারা নানান প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ধর্মের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের অস্তিত্ব আছে — এটি রক্ষা করা চেষ্টা করেছেন, ফলতঃ বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাসে একাধিক সত্তাসংক্রান্ত অভিনব মতবাদ দেখা যায়।

বৈভাষিক দর্শনের মূল আকর গ্রন্থ হল **অভিধর্ম**। এই অভিধর্ম শব্দের অর্থ হল অনাস্রব প্রজ্ঞা বা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, এবং এই অভিধর্ম বা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা লাভে সেসকল গ্রন্থ সহায়ক হয় তাদেরও গৌনার্থে অভিধর্ম নামে পরিভাষিত করা হয়। অভিধর্ম গ্রন্থটি বিভাষা গ্রন্থ ও ছয়টি প্রকরণ গ্রন্থ যথা — আর্য কাত্যায়নী পুত্রবিরচিত **জ্ঞানপ্রস্থান**, আর্য মৌদ্‌গল্যায়ন রচিত **প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্র**, আর্য বসুমিত্র রচিত **প্রকরণপাদ**, আর্য মহাকৌষ্ঠিল প্রণীত **সঙ্গীতিপর্য্যায়**, স্থবির দেবশর্মা প্রণীত **বিজ্ঞানকায়**, আর্যসারিপুত্র বিরচিত **ধর্মস্কন্ধ** এবং আর্য পূর্ণ কর্তৃক রচিত **ধাতুকায়** এই গ্রন্থাবলী যুক্ত হয়ে গঠিত। এই ষট্‌প্রকরণও যেহেতু বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভে সহায়ক হয় তাই তাদেরও অভিধর্ম বলা হয়। যদিও **অভিধর্ম** গ্রন্থটি বর্তমানে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় আচার্য বসুবন্ধু অভিধর্ম গ্রন্থের মূল বক্তব্য নিয়ে একটি সংগ্রহ গ্রন্থ **অভিধর্মকোশ** রচনা করেন। এই গ্রন্থটির নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কোশ কথার অর্থ হল সংরক্ষক বা ধারক, যেখানে অভিধর্মের মূল্যবান তত্ত্ব সংরক্ষিত আছে, তাই অভিধর্মকোশ। এই অভি শব্দের অর্থ হল অভিমুখ, যা হল ধর্মের প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাত উপলব্ধি। সেইজন্য অভিধর্মের জ্ঞান হলে ব্যক্তি বোধিপ্রাপ্ত হন। অভিধর্ম ও প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে দুটি শব্দই ধর্মের অনুসন্ধান বা পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাকে আবার ধর্মপ্রবিচয়ও বলা হয়। In the MVS, the sarvastivada master Buddhapalita explains the significans of abhi-thus; 'abhi' is a prefix signifying abhimukha. This dharma is called abhidharma because it induces all skillfull dharmas – the factors conducing to enlightenment (bodhi-paksa dharma) to manifest directly.[২] যেহেতু বৈভাষিক দর্শনের আকর গ্রন্থ রূপে

[২] Louis De La Vallee Poussin (Trans into French), Gelong Lodro Sangpo (Annoted English Translation), Abhidharmakosa-Bhasya of Vasubandhu, 2012, 2.

অভিধর্মকোশ গ্রন্থটি পাওয়া যায়, তাই এই গ্রন্থটিকে অনুসরণ করেই আমরা সত্তাসংক্রান্ত আলোচনাটি করবো, তবে একটি কথা সর্বদা মাথায় রাখতে হবে যে, অভিধর্মকোশ গ্রন্থটি বসুবন্ধু কর্তৃক রচিত হওয়ায় এবং বসুবন্ধুর দার্শনিক অবস্থানটি নিয়ে মতবিরোধ থাকায় (মনে করা হয় বসুবন্ধু হীনযান সম্প্রদায় থেকে মহাযান সম্প্রদায়ে অবস্থান্তর করেন), যথাযথভাবে বৈভাষিকদের তত্ত্ব জানা সম্ভব কি না — সেই বিষয়ে সংশয় থাকা অমূলক নয়। সুতরাং আমাদের মনকে এবং দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথাসম্ভব বিচারশীল হতে হবে।

অভিধর্মকোশ গ্রন্থটিতে সত্তার আলোচনায় কালের আলোচনা করা হয়েছে। কাল এবং সদ্‌বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য একাধিক যুক্তির উপস্থাপনা করা হয়েছে। সত্তার বা সদ্‌বস্তুর সঙ্গে কালের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বৈভাষিক দর্শনে। তারা পৃথকভাবে সত্তার লক্ষণ প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি, কালের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বা কালিকতার মানদণ্ড প্রসঙ্গে প্রথম সত্তার লক্ষণরূপে কারিত্রের ধারনা দেন। যে লক্ষণটি খুবই যৌক্তিকভাবে অসংগঠিত, এবং সমস্যাজনক। কিন্তু পরবর্তীকালীন সর্বাস্তিবাদীগণ সেই সমস্যাটি বুঝতে পেরে ক্রমাগত সত্তার লক্ষণটিকে পরিমার্জন ঘটানোর চেষ্টা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা সত্তার একাধিক ব্যাখ্যা পাবো।

অভিধম্মকোশভাষ্যের পঞ্চম অধ্যায় "**অনুশয় নির্দেশ**"-এ সর্বাস্তিবাদীদের সংস্কৃত ধর্মের **ত্রিকালাস্তিত্বের** ব্যাখ্যা বর্ণনা করা আছে। তিনকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত) সংস্কৃত ধর্মের অস্তিত্বের ধারণা সম্ভবতঃ তাদের মৌলিক অধ্যাত্মধারনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ তাদের মূল যুক্তি হল অতীত ও অনাগত ধর্ম যদি অসৎ হয় তাহলে কীভাবে জীবের বন্ধনমুক্তি সম্ভব হবে? কারণ ব্যক্তি কর্ম করে যেক্ষণে সেইক্ষণে কর্ম করার পরই কর্মটি বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কর্ম করার তৎক্ষণাৎ পরেই ব্যক্তির সেই কর্মফললাভ হয় না, বা নির্বাণলাভ হয় না। সুতরাং অতীতের কর্মকে সৎ বলতে হবে, নাহলে কর্মফললাভ বা বন্ধনমুক্তি কোনো কিছুরই সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। সুতরাং বৈভাষিকগণ বা সর্বাস্তিবাদীগণ তাদের মতের (ত্রিকালাস্তিত্বের) সপক্ষে অধ্যাত্মমূলক যুক্তি উপস্থাপন করেন। Vaibhasika ask : If the past and the future are

non-existent, how is the fact of liberation from bondage possible?[৩] তারা সর্বমোট ৭৫টি সংস্কৃতধর্মের তিনকালে বস্তুগত সত্তা স্বীকার করেন। সকল সর্বাস্তিবাদীই এবিষয়ে একমত যে, বস্তু তিনকালে অস্তিত্বশীল বা সৎ। কিন্তু কোনো ধর্ম কীভাবে তিনকালে থাকে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে ত্রিকালসত্তা প্রসঙ্গে চারটি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের অবতারণা ঘটেছে দার্শনিক সমাজে। এই মতবাদগুলি যথাক্রমে আচার্য ধর্মত্রাতের **ভাবান্যথাত্ববাদ**, আচার্য ঘোষকের **লক্ষণান্যথাত্ববাদ**, আচার্য বুদ্ধদেবের **অন্যথান্যথিকত্ববাদ**, এবং আচার্য বসুমিত্রের **অবস্থান্যথিকত্ববাদ**, নিম্নে সেইসকল মতবাদগুলির পর্যালোচনা করা হল।

ভাবান্যথাত্ববাদ (Nature changed but not the thing) ঃ-

ভদন্ত ধর্মত্রাত সংস্কৃত ধর্ম প্রসঙ্গে ভাবান্যথাত্ববাদী। এই মতবাদ অনুসারে সংস্কৃত ধর্মগুলি ত্রিকালসৎ, কিন্তু তাদের ভাবের অন্যথা বা পরিবর্তন হয়। ভাব কথার অর্থ হল আকৃতি, রূপাদি ইত্যাদি গুণ। ধর্মগুলি শুধুমাত্র একটি ভাব পরিত্যাগ করে অন্য একটি নতুন ভাব গ্রহণ করে, কিন্তু প্রকৃত বস্তুটি অবিকৃতরূপে অবস্থান করে। সুতরাং প্রকৃত বস্তুটি বা ধর্মটি তিনকালেই অস্তিত্বশীল, কেবল তাদের গুণের বা ভাবের পরিবর্তন হয়। গুণের বা ভাবের পরিবর্তনের মাধ্যমে মূল বস্তুটি কখনই পরিবর্তিত হয় না। ভাবপরিবর্তনেই বস্তুকে উৎপন্ন, বিনষ্ট ও অনাগত বলে বোধ হয় এবং তদ্অনুযায়ী আমরা ভাষা ব্যবহার করি। একটি উদাহরণ সহযোগে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যাক - "দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি স্বর্ণ অলঙ্কারের উদাহরণ দেন। একই সুবর্ণ দ্রব্য (বি.দ্র. ঃ বৈভাষিক দর্শনে দ্রব্য কথাটি বিশেষ অর্থে, ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা বৌদ্ধদর্শনে অবয়ব-অবয়বী ভাব স্বীকার করা হয় না। পরবর্তী আলোচনাগুলিতেও দ্রব্যকে ধর্ম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে) যেমন বালা, কেয়ুর, কুন্ডল প্রভৃতি বিভিন্ন অলংকারে পরিবর্তিত হয় ঠিকই, তা থেকে বোঝা যায় সুবর্ণ গুণের পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু সুবর্ণ দ্রব্য একই থাকল।[৪] সুবর্ণরূপ দ্রব্যটি একটি আকৃতি পরিত্যাগ করে অন্য আকৃতি গ্রহণ করে। যে গুণটি তিরোহিত হয়ে যায়, তা হল অতীত ধর্ম, তার প্রেক্ষিতেই দ্রব্যটিকে বিনষ্ট বলা হয়। যে ধর্মটি বা গুণটি সম্প্রাপ্ত হয় বা আবির্ভূত হয় তার ভিত্তিতে দ্রব্যটিকে উৎপন্ন বা বর্তমান বলা হয়। এবং যে আকারটি এখনও অপ্রাপ্ত তার ভিত্তিতেই বস্তুটিকে

[৩] Ibid., 37.
[৪] মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা, ১৪২২, ৬৯।

অনাগত বা ভবিষ্যত দ্রব্য বলে আখ্যায়িত করা হয়। একই কথা কালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কালের তিনটি ভাব অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। কালরূপ দ্রব্যটি একটি ভাবকে ত্যাগ করে অপর ভাব গ্রহণ করে কিন্তু কালরূপ দ্রব্যটি অপরিবর্তিত।

ভাবান্যথাত্ববাদের সমালোচনা ঃ -

আপাতদৃষ্টিতে মতবাদটি মনোরম বলে মনে হলেও মতবাদটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এই মতটি অনেকাংশে সাংখ্য পরিণামবাদের অনুরূপ হওয়ায়, পরিণামবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলি এই মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, আচার্য যশোমিত্র এবং কমলশীল নিম্নোক্ত প্রকারে এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন —

দ্রব্য বা সংস্কৃতধর্মের একটি আকার বা ভাব পরিত্যাগ করে অপর আকৃতি বা ভাবগ্রহণ প্রক্রিয়া কীভাবে সংঘটিত হয়? তা কি সংস্কৃত ধর্মের পূর্বস্বভাবের পরিত্যাগ করে পরমুহূর্তে নতুন স্বভাব গৃহীত হয় নাকি পূর্বস্বভাবের পরিত্যাগ না করেই নতুন স্বভাব গৃহীত হয়? দার্শনিকগণ দেখাবেন, উপরিউক্ত দুটি বিকল্পের কোনোটিকেই গ্রহণ করা যাবে না।

প্রথম বিকল্পটিকে গ্রহণ করলে সর্বাস্তিবাদের মূল নীতি বা বক্তব্যের, দ্রব্যাংশের ত্রিকালাস্তিত্বের উল্লঙ্ঘন ঘটবে। কারণ পূর্বস্বভাবের পরিত্যাগ করে পরমুহূর্তে যদি বর্তমানত্ব স্বভাবের গ্রহণ হয় তাহলে পূর্বস্বভাবের পরিত্যাগ ও নতুন স্বভাব গ্রহণের মধ্যবর্তী একটি ক্ষণে দ্রব্যকে নিঃস্বভাব হিসাবে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু দ্রব্য সামগ্রী বা অবস্থা অতিরিক্ত কিছু নয়। স্বভাব বির্নিমুক্তভাবে দ্রব্যের সত্তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। ফলে প্রথম বিকল্প স্বীকার করলে বলতে হয়, পূর্বস্বভাব বিনষ্ট হলে ধর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলতঃ প্রথম পক্ষ সমর্থন করলে দ্রব্য ত্রিকালসৎ - সর্বাস্তিবাদের মূল নীতি আর রক্ষা করা যায় না।

দ্বিতীয় বিকল্পটিকে গ্রহণ করলে অধ্বসাঙ্কর্য্যের আপত্তি হয়। কারণ পূর্ববর্তী বা অতীতত্ব অধ্বার অপরিত্যাগেই যদি তা বর্তমানত্ব অধ্বান্তর গ্রহণ করে তাহলে অধ্বাগুলির সাঙ্কর্য্য ঘটে যায়, যা কখনই যুক্তিসম্মত নয়। কিন্তু আচার্য ধর্মত্রাত তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে দুটি বিকল্পের কোনোটিই যথাযথ নয়। এবং দ্বিতীয় পক্ষ তিনি স্বীকার করে না, সুতরাং

অধ্বাসাঙ্কর্য্যের আপত্তি তার মতে হয় না। এবং প্রথম বিকল্পটির ক্ষেত্রে ধর্মত্রাতের বক্তব্য হল, অতীতত্বস্বভাব পরিত্যাগ ও বর্তমানত্বস্বভাব গ্রহণ সংস্কৃতধর্মে যুগপৎ হয়ে থাকে, ফলে অধ্ববিনিমুক্তভাবে সংস্কৃতধর্মগুলি থাকার যে আপত্তি উঠছিল, সেটিও আর থাকে না। এক্ষেত্রে ধর্মত্রাত ন্যায় মত অনুসরণ করে বলেছেন, স্বভাবিশেষের পরিহার হলেও দ্রব্যাংশের সত্তা পরিষ্কৃত হয়ে যায় না। কারণ ন্যায়মতে উৎপত্তিকালীন দ্রব্য নির্গুণ ও নিঃস্বভাব থাকে।

ভদন্ত ধর্মত্রাতের মতটি পর্যালোচনা করে আমার মনে হয়েছে যে, তার মতবাদে অনাত্মবাদের অনুপপত্তি হবে। অনাত্মবাদ অনুসারে 'স্থির দ্রব্য' বলে কোনো বস্তু সৎ নয়, যা কিছু আছে তা পরিবর্তনের ধারা বা প্রবাহ। বাহ্যজগতেও যেমন বাহ্যবস্তু বা জড়দ্রব্য বলে নিত্য, স্থায়ী কোনো সত্তা নেই, সবই বিভিন্ন অবস্থার ধারা বা প্রবাহ, মনোজগতেও অনুরূপভাবে কোনো স্থায়ী আত্মা নেই, সবই বিজ্ঞানের ধারা বা প্রবাহ। এমতাবস্থায়, সর্বাস্তিবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করা যায়, বস্তুর আকার, আয়তন পরিবর্তন হলেও মূল দ্রব্য তিনকালে সৎ। দ্রব্যের কোনো পরিবর্তন না হলে দ্রব্যকে স্থায়ী বা নিত্য বলে স্বীকার করতে হয়। ফলে অনাত্মবাদের উপপত্তি হয় না, কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের একটি স্তম্ভ হল অনাত্মবাদ।

লক্ষণান্যথাত্ববাদ (Character Changed but not the thing) ঃ-

আচার্য ঘোষক সংস্কৃতধর্মের ত্রিকালাস্তিত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লক্ষণান্যথাত্ববাদ প্রচার করেন। এই মতবাদের মূল কথা হল প্রত্যেক সংস্কৃতধর্মগুলি তাদের লক্ষণ যথা জাতি, জরা ও মরণ নিয়ে আবির্ভূত বা উৎপন্ন হয়। এই তিনটি লক্ষণের মধ্যে যখন যে লক্ষণটির সমুদাচার বা প্রকটিত অবস্থা দেখা যায় তখন তদ্নুযায়ী বস্তুটি বা ধর্মটিকে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত বলে প্রতীতি জন্মায় এবং সেই অনুসারে সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়। ধরা যাক মৃত্তিকা থেকে যখন ঘট উৎপন্ন হয় তখন ঘটটি অপর দুটি লক্ষণ জরা ও মরণকে সঙ্গে নিয়েই আবির্ভূত বা উৎপন্ন হয়। ঘটকে যখন উৎপন্ন দ্রব্য রূপে দেখি, তখনও তাতে জরা ও মরণরূপ অপর দুটি লক্ষণ ও সূক্ষ্মরূপে থাকে। পার্থক্য শুধু তখন সেই অবশিষ্ট লক্ষণগুলি লব্ধবৃত্তিক বা আবির্ভূত নয় তাই সেইরূপ জ্ঞান বা সংজ্ঞা আমরা প্রয়োগ করি না। জাতিরূপ লক্ষণটি লব্ধবৃত্তিক হয় বলে আমরা তাকে জাত বা উৎপন্ন বা বর্তমানকালের ঘট বলে চিহ্নিত করি। আচার্য ঘোষক এইপ্রকারে লক্ষণের অন্যথার দ্বারা সংস্কৃতধর্মের কালিকতার

মধ্যে প্রকারভেদ করলেন। ধর্মত্রাতের মতের বিরোধিতা করে ঘোষক বলেন যে, ত্রৈকালিক সত্তাতে ভাবগুলিও তাদের দ্রব্যাংশের সাথে সমান। অর্থাৎ সংস্কৃত ধর্মের প্রকারাংশ এবং দ্রব্যাংশ দুটিই অপরিবর্তিত থাকে। লক্ষণের কেবল অন্যথা বা পরিবর্তনের কথা ঘোষক বলেন। ঘোষকের বিশেষত্ব হল এই যে, ঘোষক তার এইরূপ মতবাদের সাহায্যে নিত্যধর্মের ত্রিকালাস্তিত্ব এবং তার এইরূপ মতবাদের সাহায্যে নিত্যধর্মের বা অসংস্কৃত ধর্মের ত্রিকালাস্তিত্ব এবং সংস্কৃত ধর্মের ত্রিকালাস্তিত্বের মধ্যেও পার্থক্য করেছেন। যদিও আকাশ ও প্রতিসংখ্যানিরোধাদি নিত্য ধর্মেরও ত্রিকালাস্তিত্ব সংস্কৃতধর্মের মতো আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বৈলক্ষন্যও বিদ্যমান। কারণ অসংস্কৃত ধর্মের লক্ষণাংশে অন্যথা বা পরিবর্তন হয় না। এটাই লক্ষণান্যথাত্ববাদের সারকথা।

লক্ষণান্যথাত্ববাদের সমালোচনা ঃ-

এই মতবাদটিও ত্রুটিমুক্ত নয়। আচার্য কমলশীল বলেছেন যে, সংস্কৃত ধর্মগুলি যদি জাতি, জরা ও মরণ এই তিনটি লক্ষণকে একত্রে নিয়ে উৎপন্ন হয় তাহলে অতীতত্ব, বর্তমানত্ব ও অনাগতত্ব এই অধ্বরূপ লক্ষণের সাঙ্কর্য্য হয়ে পড়ে। সুতরাং, একই সংস্কৃতধর্মে যুগপৎ সকল অধ্বাগুলি থাকায় তাদের মিশ্রণ বা সাঙ্কর্য্য অনিবার্য।

আচার্য ঘোষকের মতে, আপত্তিটি যথাযথ নয়, কারণ একই সংস্কৃতধর্মে অতীতত্ব, বর্তমানত্ব, অনাগতত্ব অধ্বার উপস্থিতি যুগপৎ থাকলেও যুগপৎ একই সময়ে অধ্বত্রয়ের জ্ঞান বা ব্যবহার কোনোটিই হবে না, বর্তমানত্ব অধ্বার সমুদাচারকালে অন্যান্য ব্যক্তি অধ্বাগুলি সমাগত হয়ে থাকে। লক্ষণের সমুদাচার বা আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত তদ্ তদ্ প্রতীতি ও ব্যবহার সম্ভব নয়।

কিন্তু পূর্বপক্ষীগণ পুনরায় আপত্তি করে বলতে পারেন যে, অনাগতত্বাদি অধ্বার লব্ধবৃত্তিক বা সমুদাচার (লাভ) দ্বারা অধ্বসাঙ্কর্য্যের আপত্তি এত সহজে নিরসন হয় না। কারণ তা বৈভাষিক মতের বিরুদ্ধে, কারণ বৈভাষিক দর্শনে একটি ধর্মের প্রাপ্তি অপর ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধেই সম্ভব হতে পারে। ধর্মধর্মী যেস্থলে অভিন্ন সেখানে এইরূপ প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। ধর্মস্বভাবগুলি (জাতি, জরা ও মরণ) সংস্কৃতধর্মগুলির সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় সংস্কৃতধর্মের পক্ষে উক্ত লক্ষণগুলির প্রাপ্তি বা লাভ কখনই সম্ভব হতে পারে না। যেমন বলা যায় মানুষ রাগ বা দ্বেষ প্রাপ্ত হতে পারে কারণ রাগ বা দ্বেষ কোনোটিই মানুষের স্বভাবজাত নয়, কিন্তু ঘট কখনও কাঠিন্যতা প্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ

ঘটটি স্বভাবতই কাঠিন্যরূপ। এছাড়াও "সংস্কৃতপদার্থের মধ্যে যা যা সত্ত্বাখ্য, অর্থাৎ প্রাণিসম্বন্ধী ধর্ম, ইন্দ্রিয়াদি বা রাগাদি ক্লেশ, তাদেরই প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি বৈভাষিক শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে; অসত্ত্বাখ্য সংস্কৃতধর্মের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি নিষিদ্ধ হয়েছে। ঘটটি কখনও লব্ধ বা সমান্বগত হয় না এবং ঘট অপর কোনো ধর্মও লাভ করতে পারে ন। অপ্রাণী লব্ধা হয় না।[৫] অতএব, লক্ষণগুলির দ্বারা অধ্বসাঙ্কর্য্যের পরিহার সম্ভব নয়।

লক্ষণান্যথাত্ববাদ পর্যালোচনা করে মনে হয় যে, মতবাদটিতে ভদন্ত ধর্মত্রাতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিটি উঠবে। লক্ষণগুলি যদি বস্তুর স্বভাব হয় তাহলে লক্ষণগুলির পরিবর্তনের সাথে বস্তুও পরিবর্তিত হবে। এবং ফলতঃ বস্তুর ত্রিকালাস্তিত্ব সম্ভব হবে না। সেইকারণে এই ব্যাখ্যাটি ত্রিকালাস্তিত্বের পক্ষে অনুরূপ ব্যাখ্যা নয়।

অন্যথান্যথিকত্ববাদ (Relative Change) ঃ-

আচার্য বুদ্ধদেবের ত্রিকালাস্তিত্ব সম্পর্কিত ব্যাখ্যাটি অন্যথান্যথিত্ববাদ নামে পরিচিত। এই মতের সার কথাই হল সংস্কৃত ধর্মের মধ্যে কোথাও কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ ইনি, আচার্য ধর্মত্রাত এবং আচার্য ঘোষকের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন যে, সংস্কৃত ধর্মের লক্ষণাংশে বা ভাবাংশে কোনো পরিবর্তন হয় না। ধর্মের পরিবর্তন আসলে আপেক্ষিক পরিবর্তন, প্রকৃত পরিবর্তন নয়। অপেক্ষা কারণের (অন্য কোনো বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে) বিভিন্নতাবশতঃ বস্তুগুলিতে অতীতত্ব, বর্তমানত্ব, অনাগতত্ব প্রকারে জ্ঞান এবং ভাষা ব্যবহার হয়। যেমন — "একই স্ত্রীলোক কোনো লোককে অপেক্ষা করে পত্নী, লোকবিশেষকে অপেক্ষা করে মাতা, এবং তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে দুহিতা নামে ব্যবহৃত হয়ে থাকেন, তেমনি একই ধর্ম বিভিন্ন ধর্মকে অপেক্ষা করে অতীত, বর্তমান, অনাগতরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।"[৬] সংস্কৃত ধর্ম একই থাকে, কারণ তার ভাব বা লক্ষণ কোনো কিছুর পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় অপেক্ষা কারণের, এবং অপেক্ষা কারণের ভেদবশতঃ একই সংস্কৃত ধর্মকে কখনও অতীতের, কখনও বর্তমানের আবার কখনও ভবিষ্যতের বিষয়রূপে জ্ঞান এবং ব্যবহার হয়। আমরা যখন কোনো একটা বস্তুকে এইভাবে প্রত্যক্ষ করি যে, তার পূর্বে অনেক বস্তু আছে এবং তার উত্তরকালেও অনেক বস্তু আছে, তখন সেই বস্তুটিকে

[৫] শ্রী অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, *বৈভাষিক দর্শন*, ১৫
[৬] তদেব., ৯.

বর্তমানরূপে বুঝি। একইপ্রকারে যখন সেই বস্তুটিকে এমনভাবে দেখবো যে তার পূর্বে অনেক বস্তু ছিল বা আছে, তখন আমরা তাকে অনাগত বলি। আবার সেই সেই বস্তুটিকেই অতীত রূপে চিহ্নিত করি। যখন তার উত্তরকালে অনেক কিছু আছে বা ছিল বলে মনে করি। এইভাবে তিনি তার অন্যথান্যথিকত্ববাদে দেখাতে সচেষ্ট হলেন যে, কীভাবে বস্তু বা সংস্কৃত ধর্মগুলি আপেক্ষিক কারণবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীত হয়, কিন্তু বস্তুর মধ্যে প্রকৃত কোনো ভেদ নেই।

অন্যথান্যথিকত্ববাদের সমালোচনা ঃ-

এই মতবাদটিও দোষমুক্ত নয়। এই মতবাদের বিরুদ্ধেও অধ্বসাঙ্কর্য্যের আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। যদি একটি বস্তুকে অপেক্ষা করে অন্য বস্তুর কালিক ব্যবহার উপপন্ন করা হয় তাহলে অধ্বসাঙ্কর্য্যের আপত্তি অনিবার্যভাবে দেখা যায়। প্রথমত, অনাগত বস্তুতে বর্তমানত্বের আপত্তি হবে, কারণ বর্তমান বস্তুকে অপেক্ষা করে যদি উত্তরবর্তী বস্তুটিকে অনাগত বলতে হয়, তাহলে উত্তরবর্তী ও বর্তমান বস্তুর একই দেশে ও একই কালে অবস্থান স্বীকার করতে হয়, ফলতঃ অনাগত বস্তুতে বর্তমানত্বের আপত্তি দেখা দেবে। দ্বিতীয়ত, একই যুক্তিতে অতীত বস্তুতেও বর্তমানত্বের আপত্তি হবে।

অবস্থান্যথিকত্ববাদ (Mode changed but not the thing) ঃ-

সংস্কৃত ধর্মের ত্রিকালাস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বশেষ এবং যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাটি হল আচার্য বসুমিত্রের অবস্থান্যথিকত্ববাদ। এই মতবাদ অনুসারে, বস্তু বা সংস্কৃত ধর্মগুলি তিনকালে অস্তিত্বশীল, এবং সংস্কৃত ধর্মের ভাব ও লক্ষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। সংস্কৃত ধর্মের অবস্থার তারতম্যেই তাতে কালিক ব্যবহার দেখা যায়। বসুমিত্র তার পূর্ববর্তী আচার্যগণের সঙ্গে এক্ষেত্রে বিরোধিতা করে বলেন যে, ধর্মের লক্ষণাংশে বা ভাবাংশে কোনো পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় কেবল অবস্থার। এই অবস্থা হল বসুমিত্রের কাছে কারিত্র। কারিত্ররূপ অবস্থার তারতম্যেই বস্তুকে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত বলে জ্ঞান হয় এবং তদ্‌অনুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হয়। "যেমন কতগুলি গুলিকা বাম থেকে দক্ষিণে তাদের অবস্থানদেশের তারতম্যে কেউ এককাঙ্কে পড়ে কেউ বা শতকাঙ্কে পড়ে; এবং এখন যা শতকাঙ্কে আছে তাহাকে স্থানচ্যুত করে এককাঙ্কের স্থানে এবং এককাঙ্কে তাহার স্থানে স্থাপন করলেই দেখা যায় যে, দ্রব্য, ভাব বা লক্ষণাংশের কোনও পরিবর্তন ব্যতিরেকেই পূর্বে যা শতকাঙ্কে

পড়েছিল এখানে তাই আবার এককাঙ্কে এবং যা এককাঙ্কে ছিল তাই শতকাঙ্কে পড়িয়াছে; তেমনি সংস্কৃত ধর্মগুলিও এক্ষণে যা বর্তমান অতীত বা অনাগত, কারিত্রের তারতম্যে তাই অনাগত, বর্তমান বা অতীত হয়ে পড়ে।"[৭] একটি সংস্কৃত ধর্ম যখন কারিত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তখন তা বর্তমান ধর্ম, যখন তার কারিত্র বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তা অতীত ধর্ম এবং যখন সংস্কৃত ধর্মের সঙ্গে কোনো প্রকার কারিত্রের যোগ থাকবে না (অপ্রাপ্তকারিত্র), তখন তাকে অনাগত ধর্ম বলে। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপ সংস্কৃত ধর্মের কারিত্র হল দর্শন। কারিত্র কথার অর্থ হল প্রত্যেক ধর্মের নিজ নিজ কার্যসম্পাদন করা। এবং এই কার্যসম্পাদন করারূপ কারিত্রের অবস্থার ভিন্নতায় বস্তুতেও ভিন্ন ভিন্ন কালিক ব্যবহার উপপন্ন হয়।

আমরা দেখলাম যে, বস্তুর তিনকালে অস্তিত্ব স্বীকার করেও কীভাবে কালিকতার প্রকারভেদ করা যায়, তার ব্যাখ্যা উপরিউক্ত চারজন আচার্য চারভাবে প্রদান করলেন। এরমধ্যে আচার্য বসুমিত্রের বক্তব্যটি বেশি গ্রহণযোগ্য। তিনি কারিত্রেকে কালিকতার মানদণ্ড হিসাবে উল্লেখ করলেন, যা পরবর্তীকালে সত্তার লক্ষণ হিসাবে গৃহীত হয়, তাদের মূল বক্তব্য হল — যেসকল ধর্মগুলি এখনও পর্যন্ত কারিত্রপ্রাপ্ত হয়নি তারা ভবিষ্যত ধর্ম। যেসকল ধর্মগুলি সবেমাত্র কারিত্রবিশিষ্ট হয়েছে সেগুলি বর্তমান ধর্ম। এবং যেসকল সংস্কৃত ধর্মের কারিত্র বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেছে, তা হল অতীত ধর্ম। কারিত্র বলতে সাধারণত প্রত্যেক ধর্মের নিজ নিজ ক্রিয়াসম্পাদনকেই বোঝানো হয়েছে। কারিত্র হল সৎ বস্তুর একপ্রকার বিশেষ উপাদান, যাকে কার্যোৎপাদন সামর্থ্যের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এবং যেসকল ধর্ম এই প্রকার সামর্থ্যহীন তারা অতীত এবং ভবিষ্যত ধর্ম। এবং এই একই মানদণ্ড বা বৈশিষ্ট্যের বিচারে অ-বাস্তব/অ-বর্তমান (Non-actual)। সর্বাস্তিবাদীগণের মতবাদের বিশেষত্ব এবং অনন্যতা হল তারা সৎ বস্তুকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। একধরণের সৎ বস্তু হল কার্যোৎপাদন সামর্থ্যযুক্ত বর্তমান বস্তু। আরেকধরণের সৎ বস্তু হল কার্যোৎপাদনসামর্থ্যহীন অ-বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যত বস্তু। অতীত ও ভবিষ্যত ধর্ম বর্তমানের ন্যায় সৎ হলেও তাদের সাথে বর্তমান বস্তুর পার্থক্য বিদ্যমান। অতীত ও ভবিষ্যতের বস্তু কার্যোৎপাদন সামর্থ্যহীন। সুতরাং কারিত্র হল প্রধাণত একটি মানদণ্ড যার দ্বারা বর্তমান রূপ সৎ বস্তু নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। এই মানদণ্ড না থাকলে অতীতের ধর্মকে বর্তমানের ধর্ম থেকে বা

[৭] তদেব., ১১.

বর্তমানের ধর্মকে ভবিষ্যতের ধর্ম থেকে পৃথক করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। “Dharmas as past and present are real but they are wanting in karitra” (efficiency).[৪]

কারিত্রের ধারণাটি আমরা বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই যে, তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে উন্নত হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে। মহাবিভাষায় প্রদত্ত কারিত্রের ধারণাটি প্রাচীনতম ধারণা। সেই মহাবিভাষার কারিত্রের ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করে অভিধর্মে কারিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন অভিধর্ম গ্রন্থের প্রথাগত কারিত্রের লক্ষণে সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় আচার্য বসুমিত্র কারিত্রের এক অভিনব ব্যাখ্যা দেন। বসুমিত্রের ব্যাখ্যাটি আভিধার্মিক ছয়টি কারণতত্ত্বের ওপর নির্ভর করে প্রদান করেছেন। কিন্তু বসুমিত্রের মতবাদটিও যথাযথ না হওয়ায় পুনরায় সর্বাস্তিবাদী সঙঘভদ্র কারিত্রের এক অনন্য ব্যাখ্যা দেন। যে ব্যাখ্যাটি থেকেই ধর্মকীর্তির সত্তার লক্ষণ অর্থক্রিয়াকারিত্বের ধারণাটি সরাসরিভাবে গড়ে ওঠে।

মহাবিভাষায় এবং অভিধর্মে প্রদত্ত কারিত্রের প্রথাগত লক্ষণ এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি ঃ-

কালিকতার প্রকারভেদ বা মানদণ্ডরূপে মহাবিভাষায় যে কারিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাকে প্রাচীনতম ব্যাখ্যারূপ উল্লেখ করা যায়। কারিত্রের ব্যাখ্যায় সেখানে স্বলক্ষণ অথবা ধর্মস্বভাবের সঙ্গে বস্তুর সক্রিয়া, বৃত্তি বা কারিত্রের একপ্রকার সমতার সম্পর্কস্থাপন করা হয়েছে এবং কারিত্রকে স্বলক্ষণের সাহায্যে বোঝা হয়েছে। মহাবিভাষায় এই প্রকার আলোচনাকে পাথেয় করেই অভিধর্ম গ্রন্থে কারিত্রের লক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সেখানে ধর্মস্বভাবকে লক্ষ্য করে, তাকে কারিত্ররূপ লক্ষণবাক্যের দ্বারা লক্ষ্যায়িত করা হয়েছে। “This equation is further exemplified in the definitions of the Abhidharma: the essence of a dharma, its svabhava or definiendum (=laksya) is defined by its karitra (=svakriya or svalaksana) as definiens.”[৯] যদিও কারিত্র ও ধর্মস্বভাবের মধ্যে একপ্রকার সম্পর্কের উল্লেখ করলেও সেই সম্পর্কের স্বরূপ কী তা নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট করে মহাবিভাষাকার ব্যক্ত করেননি।

---

[৮] Braj. M. Sinha, Time and Temporality in Samkhya-Yoga and Abhidharma Buddhism, 1983, 105.

[৯] Ibid., 1983, 105.

কারিত্র এবং ধর্মস্বভাবের (স্বলক্ষণ) আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক কিরূপ এই প্রসঙ্গে দুটি বিকল্প সম্পর্কের কল্পনা করা যেতে পারে, কারিত্র এবং স্বভাব এক অথবা ভিন্ন? এই বিষয়কে কেন্দ্র করে মহাবিভাষায় নিম্নোক্ত যুক্তি দেওয়া হয়েছে -

কারিত্র এবং ধর্মস্বভাব ভিন্ন অথবা অভিন্ন তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। প্রত্যেকটি সাস্রব ধর্মের স্বভাব বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত যথা (জাতি, জরা, মরণ, অনিত্য ইত্যাদি)। এইসকল লক্ষণের সঙ্গে ধর্মের ক্রিয়া এক না ভিন্ন সেই প্রসঙ্গে মহাবিভাষার লেখকগণ কোনো সদুত্তর দেননি। কারিত্র ও ধর্মস্বভাবের সম্পর্কের স্বরূপ তাদের একটি সত্তাতাত্ত্বিক প্রকল্পকে নির্দেশ করে সেটি হল সত্তার অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার সামর্থ্য আছে। কারিত্র রূপসামর্থ্য সৎ-এর অন্তর্ভুক্ত হলেও তা সত্তার অন্যান্য সম্ভাবনাকেও (অতীত, ভবিষ্যত ধর্ম) অন্তর্ভুক্ত করে। এইভাবে তারা কারিত্রকে কালিক প্রকারভেদের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমন রূপের কাজ বা কারিত্র হল প্রতিঘাত করা। যখন প্রতিঘাত করা রূপ ক্রিয়াটি সম্পাদন করে, তখন তা বর্তমান ধর্ম।

সংস্কৃত ধর্মগুলি সমানভাবে ত্রিকাল সৎ হলেও কারিত্রের দ্বারা তাতে অনাগতত্বাদি ব্যবহার ও প্রতীতি ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, ব্যবস্থাপক কারিত্রটি কি? এর উত্তরে বলা হয় সেই সেই সংস্কৃতধর্ম সমূহের নিজ নিজ কাজগুলিই তাদের কারিত্র। চক্ষুর নিজ কাজ হল দেখা। অতএব, এটাই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কারিত্র বা বিশেষ কার্য বলা যায়। এই প্রকারে অন্যান্য সংস্কৃত ধর্মগুলির কারিত্র বুঝতে হবে। যেমন - কর্ণেন্দ্রিয়ের কারিত্র শ্রবণ, জিহ্বার কারিত্র রসাস্বাদন ইত্যাদি। এইরূপ কারিত্রের যোগ বস্তুতে বর্তমানত্বের, তার বিয়োগে অতীতত্বের এবং তার অপ্রাপ্তিতেই অনাগতত্বের প্রতীতি ও ব্যবহার হবে।

আপত্তি ঃ যদি কারিত্র ও ধর্মস্বভাব এক হয় তাহলে বর্ণনা করতে হবে যে, বর্তমান ধর্ম কারিত্রবিশিষ্ট হওয়ার অর্থ কী আবার কোন্ অর্থে বলা যাবে যে (পূর্বের ধর্ম) ধর্মের কারিত্র বিনষ্ট হয়েছে? কারণ ধর্ম ও কারিত্র এক হলে ধর্মের কারিত্র বিনষ্ট হওয়ার অর্থ হল ধর্মস্বভাব বিনষ্ট হওয়া, ফলস্বরূপ বস্তুর ধর্মের অসত্তা স্বীকার করতে হয়,যা সর্বাস্তিবাদের মূল নীতির বিরোধী (মূল নীতিটি হল — সংস্কৃত ধর্ম তিনকালেই অস্তিত্বশীল)।

এছাড়াও যদি কোনো ধর্মকে তার বিশেষ কার্যসম্পাদনের (কারিত্র) দ্বারা বর্তমান বলে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে যে বস্তু বিদ্যমান থেকেও আপন কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাকে এই ব্যাখ্যা অনুসারে আর বর্তমান বলা যাবে না। যেমন ধরা যাক, যে চক্ষু বর্তমান থেকেও অন্ধকার রূপ প্রতিবন্ধকতাবশতঃ বা নিদ্রারত হওয়ার কারণে দর্শনরূপ কারিত্র উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হচ্ছে তাকে আর বর্তমান চক্ষু বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না। অথচ কারিত্রের অযোগও তাতে বর্তমানত্বের প্রতীতি আমাদের অনুভবসিদ্ধ। কারিত্রের অযোগও চক্ষুধর্মে বর্তমানত্বের প্রতীতি হওয়ায় তাহলে কারিত্রকে কালিকতার প্রকারভেদের মানদণ্ড বা নির্ণায়ক আর বলা যায় না। ফলতঃ প্রাচীন মহাবিভাষার কারিত্রের ব্যাখ্যা সমস্যাজনক। এই সকল সমস্যা থেকে কারিত্রের ধারণাকে মুক্ত করতে আচার্য বসুমিত্র অন্যভাবে কারিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, যার দ্বারা উপরিউক্ত আপত্তিকে সহজেই দূর করা যায়।

কারিত্রপ্রসঙ্গে আচার্য বসুমিত্রের বক্তব্য ঃ

বিখ্যাত সর্বাস্তিবাদী সঙঘভদ্রের বিশ্লেষণমূলক কারিত্রের ধারণা আলোচনা করার পূর্বে আচার্য বসুমিত্র মহাবিভাষাকে অনুসরণ করে যেভাবে কারিত্রের লক্ষণ দিয়েছেন সেটা জানা প্রয়োজন। বসুমিত্রের ব্যাখ্যানুসারে A নামক ধর্মের যে সক্রিয়া বা বিশেষ ক্রিয়া তা শুধুমাত্র A নামক ধর্মের জন্য উৎপন্ন নয়, রবং তা তার পূর্ববর্তী ধর্ম P,Q,R ইত্যাদির দ্বারা A নামক ধর্মের ক্রিয়া কারণগতভাবে নির্ধারিত। প্রত্যেকটি ধর্মের ক্রিয়াই তার পূর্ববর্তী ধর্মের দ্বারা নির্ধারিত হবে। এবং বর্তমান ধর্মের ক্রিয়া একই প্রণালীতে ভবিষ্যত ধর্মের ক্রিয়ার হেতু বা কারণ হবে। অভিধর্মে ছয় প্রকার কারণ স্বীকার করা হয়েছে যথা — (১) সহভূকারণ (যে কারণটি ধর্মের সঙ্গে একই সময়ে থাকে), (২) সমনন্তরকারণ (অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ), (৩) সভাগকারণ (সমজাতীয় কারণ), (৪) সর্বত্রগকারণ (যা সর্বকালীন নৈতিক কারণ), (৫) বিপাককারণ (নির্দিষ্ট নৈতিক কারণ), (৬) অধিপতিকারণ (সাধারণ নঞর্থক কারণ)।প্রত্যেকটি কার্য এই ছয়টি কারণকে অপেক্ষা করে উৎপন্ন হয়। বসুমিত্রের কারিত্রের ব্যাখ্যা অভিধর্মের কারণতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল।

কারিত্র বলতে যদি ধর্মের নিজ নিজ কার্যসম্পাদনকে বোঝালে, যে বর্তমান চক্ষু বিদ্যমান থেকেও কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে তার কার্য উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না, তাকে সেই যুক্তিতে

কারিত্রবিশিষ্ট বলা যাবে না, এবং বর্তমান ও দাবী করা যাবে না। এইরূপ আপত্তি বসুমিত্রের বক্তব্যে দেখা যায় না। কারণ বসুমিত্র বলেন তৎ-সভাগ চক্ষুরিন্দ্রিয়টিতে যদিও উক্ত কারিত্রের যোগ নেই একথা সত্য, কিন্তু চক্ষু সামান্যতঃ কারিত্রশূন্য নয়। কারণ অন্ধকারেও চক্ষু নিস্যন্দফল বা পুরুষকারফল প্রদান করছে এবং সেই ফলের প্রতি সভাগহেতুরূপে অবস্থান করে উক্ত নিস্যন্দফলের প্রতিগ্রহও করছে। অর্থাৎ বসুমিত্রের কাছে কারিত্র হল ফলদানপ্রতিগ্রহণ। পুরুষকার হল যে ধর্মের যা কর্ম বা ব্যাপার, তাই সেই ধর্মের পুরুষকারফল। এই যে ফলদান বা ফলপ্রতিগ্রহ বা হেতুরূপে অবস্থান, তাই কারিত্র। এই প্রকার কারিত্রের যোগ ধর্মগুলিতে বর্তমানত্বের, বিয়োগে অতীতত্বের এবং অপ্রাপ্তিতে অনাগতত্বের প্রতীতি ও ব্যবহার করে। কারিত্র মানে এখানে হেতুভাবাস্থান বা ফলদানপ্রতিগ্রহ।

আপত্তি ঃ বসুমিত্রের কারিত্রের ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়। পূর্বপক্ষীগণ আপত্তি করে বলেন, ধর্মের কারিত্রকে যদি অন্যান্য ধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধের দ্বারা বুঝি, তাহলে অতীতের ধর্মগুলিকে বর্তমান বলে স্বীকার করতে হবে। বৈভাষিক মতে অতীত সভাগ এবং বিপাক হেতুতে ফলদান স্বীকৃত হয়েছে। যেমন - কর্মফললাভ। কর্মরূপ কারণটি উৎপাদস্থিতি ব্যয়বিশিষ্ট। কার্য করার অব্যবহিত পরবর্তীক্ষণেই ফললাভ হয় না। যদি স্বীকার করা হয় যে, একটি ধর্ম অপর ধর্মকে নির্ধারণ করে, তাহলে আবশ্যিকভাবে এটা বলতে হয়, অতীত ধর্মটি ফলপ্রদান করার অপেক্ষায় বর্তমানকাল পর্যন্ত অবস্থান করে। অর্থাৎ পুনরায় অতীত ধর্মকে অধ্ব-বর্তমান বলে স্বীকার করতে হয়।

অধ্বসাঙ্কর্য্যের আপত্তির সমাধান ফলদানরূপ কারিত্রের দ্বারা নয়, বরং ফলপ্রতিগ্রহণরূপ বা ফলক্ষেপরূপ কারিত্রের দ্বারা করা হয়েছে। ফলতঃ অতীত সভাগহেতু বা বিপাকহেতুতে বর্তমানত্বের আপত্তি অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি হবে না। কারণ ফলের আক্ষেপ হেতুগুলি বর্তমান অবস্থায় করে থাকে। উৎপন্ন ওই ফলগুলি নির্দিষ্ট থাকে। অতীত অবস্থায় উপনীত সভাগ বা বিপাক হেতুগুলি যথাসময়ে ঐ পূর্বোৎপন্ন ফলগুলি প্রদান করে। সুতরাং ফলাক্ষেপরূপ কারিত্র অতীত দশাতে থাকে না, আর অতীত হেতুতে বর্তমানত্বের প্রতীতিরূপ আপত্তি সঙ্গত নয়। ফলক্ষেপের যোগেই বর্তমানত্বের, ফলাক্ষেপের বিয়োগে অতীতত্বের এবং ফলাক্ষেপের অপ্রাপ্তি অনাগতত্বের নিয়ামক হবে।

সঙ্ঘভদ্রের মতে কারিত্রের ধারণা ঃ

আচার্য সঙ্ঘভদ্র কারিত্র বলতে প্রকৃত কোনো কার্যোৎপাদনকে যেমন নির্দেশ করেননি, তেমনি বসুমিত্রের ন্যায় কারিত্র অন্যান্য ধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল — একথাও বলেননি। পূর্ববর্তী সর্বাস্তিবাদীদের ন্যায় ধর্মস্বভাবকেই কারিত্র বলেন এবং কারিত্রকেই কালিক প্রকারভেদের মানদণ্ড হিসাবে স্বীকার করেন। তার কারিত্র হল সঙ্ঘভদ্রের কাছে, ফলাক্ষেপশক্তি। ধর্মের কারিত্র ফলের প্রতি অভিক্ষেপ করে, ফলোৎপাদন বা ফলদান করে না। বর্তমান ধর্মেরই কেবলমাত্র ফলাক্ষেপশক্তি থাকে। যে ধর্মটি ফলের প্রতি আক্ষেপ করে ফেলেছে সেটা কারিত্রের বা বর্তমান ধর্মের অংশ হতে পারে না, কারণ অন্যথায় অনবস্থা ঘটে। অতীতের কোনো ধর্মই কারিত্রবিশিষ্ট না হওয়ায় কালিক প্রকারভেদের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয় না।

পূর্বোক্ত সকল কারিত্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলিকে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন। কারিত্রকে ফলাক্ষেপশক্তি রূপে দেখে, ফলদানের পরিবর্তে। তিনি কোনো সমস্যার মধ্যে পড়েননি।

সঙ্ঘভদ্রের অপর একটি বিশেষত্ব হল, তিনি সামর্থ্য এবং কারিত্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সৌত্রান্তিকগণ সাধারণত সর্বাস্তিবাদীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে সর্বাস্তিবাদীদের বক্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে ব্যর্থ হয়ে। শক্তি দুপ্রকার — সামর্থ্য ও কারিত্র। ধর্মের সামর্থ্য এবং কারিত্র ভিন্ন। কারিত্র হল বিশেষ প্রকারের সামর্থ্য। সাধারণ সামর্থ্য বাহ্য পরিবেশের এবং অবস্থার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কারিত্র হল ফলাক্ষেপসামর্থ্য। এমন কিছু সামর্থ্য থাকে যা কারিত্র থেকে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অন্ধকারে চক্ষুধর্মের যে রূপদর্শনের সামর্থ্য সেটি আবরণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু তার ফলাক্ষেপশক্তিরূপ কারিত্র তা অন্ধকারের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে না। অন্ধকারেও তা ফলাক্ষেপ করতে সমর্থ। অতীত ধর্মের সামর্থ্য আছে, যেহেতু অন্য স্বভাব উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি নির্ধারক হিসাবে কাজ করে। সর্বাস্তিবাদীদের ন্যায় সঙ্ঘভদ্র ধর্মের তিনক্ষণে অস্তিত্ব মানে। এবং তিনটি ক্ষণেই তা স্বলক্ষণবিশিষ্ট।

আচার্য শান্তরক্ষিত তাঁর তত্ত্বসংগ্রহ গ্রহের ২১তম অধ্যায় 'ত্রৈকাল্যপরীক্ষা' অংশে প্রথম আটটি সূত্রে তিনি সর্বাস্তিবাদীদের মূল বক্তব্যকে উপস্থাপনা করেছেন। এবং পরবর্তী বাহান্নটি সূত্রে

তিনি কারিত্র সংক্রান্ত বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। ফলতঃ এই অধ্যায়ে তার মূল খণ্ডনের বিষয় হল কারিত্র।

শান্তরক্ষিত প্রথমেই যে প্রশ্নটি দিয়ে সর্বাস্তিবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করেছেন সেটি হল কারিত্র কি ধর্মস্বভাবের সঙ্গে এক না ভিন্ন? একটি ধর্ম যদি তিনটি কালে সৎ হয়, কিন্তু কারিত্র কেবলমাত্র তার বর্তমান কালেই বিদ্যমান। তাহলে তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক কিরূপ বলা যায়? শান্তরক্ষিত বলেন সর্বাস্তিবাদীগণ দুটি বিকল্পের মধ্যে কোনো একটিকেও গ্রহণ করতে পারবেন না, কারণ তাহলে সেটি তাদের দর্শনের মূল তত্ত্বের বিরোধী হয়ে যাবে।

(১) **কারিত্র এবং ধর্মস্বভাব ভিন্ন ঃ** যদি কারিত্র এবং ধর্মস্বভাবের মধ্য দ্রব্যগত পার্থক্য স্বীকার করি তাহলে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যত ধর্মের মধ্যে নিঃস্বভাবতা স্বীকার করতে হবে। কারণ কারিত্র কেবলমাত্র বর্তমানে ক্রিয়াশীল হয়। সদাসত্ত্ব ব্যতিরেকে অন্য কোনো নিত্যতার মানদণ্ড থাকতে পারে না। ধর্মস্বভাব সর্বদা বর্তমান থাকবে। কিন্তু সর্বাস্তিবাদীদের মতানুসারে সংস্কৃত ধর্ম সর্বদা স্থায়ী হয়, কিন্তু তারা নিত্য নয়। এছাড়াও বুদ্ধদেব ও কারিত্রের সত্তা স্বীকার করেননি। তিনি বলেন সব বস্তুই পাঁচটি স্কন্ধ, বারোটি আয়তন এবং আঠারোটি ধাতুর অন্তর্গত।

কারিত্র ও ধর্ম এক ও অভিন্ন ঃ এই মতের বিরুদ্ধেও আপত্তি আছে। কারিত্র ও ধর্ম ভিন্ন না হলে কারিত্রও ধর্মের ন্যায় সর্বদা বর্তমান থাকবে। ফলতঃ কারিত্রের দ্বারা কালিক প্রকারভেদ করা যাবে না, এবং কারিত্রের যোগ, বিয়োগ, অপ্রাপ্তির যে ব্যাখ্যা তাও অর্থহীন হয়ে যাবে।

সর্বাস্তিবাদীগণ কর্তৃক উক্ত আপত্তির খণ্ডন ঃ তারা বলেন ধর্মস্বভাব ও কারিত্রের সম্পর্কের উপরিউক্ত দুটি প্রসঙ্গ (তাদাত্ম্য এবং ভেদ) সকল সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করে না, সর্বাস্তিবাদীগণ তৃতীয় একটি বিকল্পের উল্লেখ করেন। কারিত্র ধর্মের সঙ্গে একেবারে পৃথক নয়, আবার তারা সম্পূর্ণ একও নয়। কারিত্র একেবারে ধর্ম থেকে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল নয়, কিন্তু তারা সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং স্থায়ীভাবে অবস্থান করে একথাও বলা যায় না।

সর্বাস্তিবাদীদের প্রসক্ত যুক্তিটির দুটি দিক হল প্রথমত, সংস্কৃত ধর্মগুলি নিত্য নয়, ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে যে নিত্যতা তা কেবল অসংস্কৃত ধর্মের বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত ধর্মের চারটি

লক্ষণবিশিষ্ট। ফলতঃ সৌত্রান্তিকগণ যে নিত্যতার আপত্তি তুলেছেন তা না বুঝে। কারণ, সর্বাস্তিবাদীরা সংস্কৃত ধর্মের শর্তাধীনতার কথা বলেছেন — উৎপন্ন, ধ্বংস, ধারাবাহিকতা, অনিত্যতা বিশিষ্ট ধর্ম যখন অনিত্য তখন কারিত্রও অনিত্য।

কারিত্র ও ধর্ম ভিন্ন হতে পারে না, যেহেতু কারিত্র ও ধর্মকে ভিন্ন বলার অর্থ বর্তমান ধর্মের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থার নিঃস্বভাবতা স্বীকার করা। কারিত্রের যে পার্থক্য অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ধর্মের থেকে সেটি তার ক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে।

কিন্তু সর্বোপরি শান্তরক্ষিত দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, সঙঘভদ্রের ফলাক্ষেপশক্তির সঙ্গে ধর্মকীর্তির কার্যোৎপাদন সামর্থ্যরূপ অর্থক্রিয়াকারিত্বের ধারণার মধ্যে মিল রয়েছে। ফলে আক্ষেপরূপশক্তিটি কোনো ধারণাগত বিষয় নয়। কারণ, শক্তি সৎ বস্তুর নিজস্ব বা স্বলক্ষণ। সঙঘভদ্রের মতে এই শক্তিটি কেবলমাত্র বর্তমানে বিদ্যমান থাকে এবং এই ফলাক্ষেপশক্তিটিই হল সৎ বস্তুর স্বলক্ষণ।

সঙঘভদ্র সর্বাস্তিবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলেন তিনটি কালেই ধর্মগুলি সৎ। অতীত ও বর্তমান কালের ধর্মগুলি সৎ হলেও তাদের ফলাক্ষেপশক্তি থাকে না। এই শক্তির দ্বারাই বর্তমান ধর্ম থেকে অতীত ও ভবিষ্যত ধর্মকে পার্থক্য করা হয়। শান্তরক্ষিত সৌত্রান্তিকগণের দৃষ্টিকোণ থেকে সঙঘভদ্রের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেন যে, যে ধর্ম ফলাক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট তাই কেবল সৎ, অতীত ও ভবিষ্যত ধর্মের ফলাক্ষেপশক্তি না থাকায় তারা সৎও নয়। কারণ তারা সৎ হলে তাদেরও কার্যোৎপাদন সামর্থ্য থাকতো। যেহেতু কার্যোৎপাদন সামর্থ্য তাদের নেই, তাই তারা সৎ একথা বলা যায় না। যুক্তি দেওয়া হয়েছে - অতীত ও ভবিষ্যত ধর্মের কি কার্যোৎপাদনের সামর্থ্য আছে অথবা নেই? যদি তাদের সেই সামর্থ্য থাকে তাহলে তারা সৎ বস্তু, যেমন বর্তমান বস্তু। যদি তাদের বর্তমান না বলা হয়, অনিবার্যভাবেই বলতে হয় অতীত ও ভবিষ্যত ধর্ম সেই কার্যোৎপাদন সামর্থ্যহীন, যেমন আকাশকুসুম। অতএব, তা অসৎ।

ধর্মকীর্তির মতবাদটিকে শান্তরক্ষিত সঙঘভদ্রের মতবাদের পরিমার্জিত রূপ হিসাবে দেখেন। সঙঘভদ্রের ফলাক্ষেপশক্তি ধর্মকীর্তির অর্থক্রিয়াশক্তি। অর্থক্রিয়াশক্তি হল সৎ-এর লক্ষণ। যাদের এইরূপ শক্তি আছে তারা বর্তমান এবং সেই কারণে একমাত্র বর্তমান বস্তুই বা ধর্মই সৎ।

সুতরাং অতীত ও ভবিষ্যত ধর্মের এই প্রকারের কার্যোৎপাদন শক্তি না থাকায় তারা বর্তমান নয় এবং বর্তমান না হওয়ায় সৎ ও নয়। ফলতঃ ধর্মকীর্তির কাছে কেবলমাত্র বর্তমান ক্ষণেই বস্তু সৎ। তিনক্ষণে ধর্মের সত্তা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। এবং অনুভবসিদ্ধ নয়। তাই তারা ক্ষণিকত্ববাদী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দার্ষ্টান্তিক আচার্য ভদন্ত রামের দৃষ্টিতে সত্তার ধারণা

প্রথম অধ্যায়ে আমরা সর্বাস্তিবাদের সত্তাসংক্রান্ত মতবাদ আলোচনা করতে গিয়ে প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম যে, এই আলোচনা আচার্য বসুবন্ধুর অভিধর্মকোশভাষ্য অনুসরণ করেই করা হবে। সুতরাং সেখানে কাশ্মীর সর্বাস্তিবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা বা আপত্তি করেছি আচার্য বসুবন্ধুর অভিধর্মকোশভাষ্য অনুসারে। আচার্য বসুবন্ধুর দার্শনিক অবস্থান নিয়ে যে মতবিরোধ আছে সেকথাও পূর্বে বলা হয়েছে। তিনি প্রথম জীবনে হীনযান মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তীকালে একজন স্বনামধন্য যোগাচার বিজ্ঞানবাদী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **বিংশতিকাপ্রকরণবৃত্তি** বিজ্ঞানবাদের একটি আকর গ্রন্থ। যে গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'বিজ্ঞান বা চেতনাই যে একমাত্র পরমার্থ সৎ' তা প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব খন্ডনেও প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে এই বিষয়ে একাধিক যুক্তি তিনি প্রদান করেছেন। ফলতঃ অভিধর্মকোশভাষ্যে যতই তিনি সৌত্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ করে সর্বাস্তিবাদকে খন্ডন করুন না কেন তা কতটা যথার্থ এই বিষয়ে সংশয় থেকেই যাবে। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমার উদ্দেশ্য হল বসুবন্ধুর পূর্বে কোনো সৌত্রান্তিক আচার্যের সত্তার ধারণা উল্লেখ করা। এমনই একজন ব্যক্তিত্ব হলেন ভদন্ত রাম। ভদন্ত রামের সময়কাল যেহেতু আচার্য বসুবন্ধু ও ধর্মকীর্তি উভয়েরই পূর্বে, তাই সর্বাস্তিবাদের সত্তার ধারণা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভদন্ত রামের (দার্ষ্টান্তিক-সৌত্রান্তিক) সত্তার আলোচনা করা সমীচীন হবে। এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আচার্য ধর্মকীর্তির সত্তাসংক্রান্ত অভিমত উপস্থাপিত করা হবে। সত্তার ধারণাটিকে যথাযথভাবে বুঝতে গেলে এই ধারাবাহিকতাটিকে লক্ষ করা একান্তই প্রয়োজনীয়। তাই আমি আমার অধ্যায় বিভাজনটি এই প্রকারে নির্ণয় করেছি।

ভদন্ত রামের সত্তাবিষয়ক আলোচনাটি শুরু করার পূর্বে দার্ষ্টান্তিক সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন।

দার্ষ্টান্তিক সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান ঃ-

কাশ্মীরি সর্বাস্তিবাদের মূল প্রতিপক্ষ হিসাবে মহাবিভাষায় দার্ষ্টান্তিকের নামোল্লিখিত করা হয়েছে। সেই তুলনায় সৌত্রান্তিক শব্দটি মাত্র দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। "From the standpoint of both the virulence of attack and frequency of citation, the primary opponent of kasmira sarvastivadins recorded in the Mahavibhasa is the Darstantikas."[১০] পরবর্তীকালে বসুবন্ধুর অভিধর্মকোশভাষ্যে মহাবিভাষার বিপরীত ভঙ্গি দেখা গেছে, সেখানে কাশ্মীরি সর্বাস্তিবাদের মূল প্রতিপক্ষ হিসাবে সৌত্রান্তিকগণেরই একাধিকবার নামোল্লেখ করা হয়েছে (প্রায় কুড়িবার 'সৌত্রান্তিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে) দার্ষ্টান্তিকের (মাত্র তিনবার) তুলনায়। আচার্য সঙঘভদ্রও তাঁর গ্রন্থে দার্ষ্টান্তিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার কর্তৃক দুটি শব্দের অনিয়ত ব্যবহার দেখে স্বভাবতই সাধারণ মানুষের বা পাঠকের মধ্যে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এই দুই সম্প্রদায় কি এক ও অভিন্ন সম্প্রদায়, যাদের পার্থক্য কেবল সময়গত, কিন্তু যাদের উৎস এক। অর্থাৎ অনেক ব্যাখ্যাকারগণই মনে করেন যে, সৌত্রান্তিক ও দার্ষ্টান্তিক সম্প্রদায় একই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়েরই দুটি নির্দেশক শব্দ, যাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল উৎপত্তিগত। এবং দার্ষ্টান্তিক শব্দটি একটি প্রাচীন শব্দ, যা পরবর্তীকালে সৌত্রান্তিক শব্দের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু বহু প্রশ্ন দেখা যায় যে, প্রথাগত বৌদ্ধদর্শনে কি দার্ষ্টান্তিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিন্নতা প্রদর্শন করার সপক্ষে কোনো যুক্তি আছে? এবং যদি দুটি সম্প্রদায় অভিন্ন হয় বা এক হয় তাহলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার হেতু কী? সঙঘভদ্রও কেন দার্ষ্টান্তিক শব্দটি ব্যবহার করলেন? হয় দার্ষ্টান্তিক সম্প্রদায় কি ভিন্ন কোনো সম্প্রদায় (সৌত্রান্তিক ভিন্ন) অথবা তারা সর্বাস্তিবাদেরই কোনো উপ সম্প্রদায়, যাদের তত্ত্বগত পার্থক্য রয়েছে? এইসকল প্রশ্নের আশানুরূপ উত্তর দেওয়া সম্ভব কিনা তা জানি না। তবে দার্ষ্টান্তিক শব্দটির ব্যুৎপত্তির অর্থ এবং গবেষক কাটো জুনশোর গবেষণা থেকে আমরা হয়তো কিছুটা প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবো।

কাটো জুনশো তাঁর গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেন যে, দার্ষ্টান্তিক শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থকে কেন্দ্র করে এক একজন ব্যাখ্যাকার এক একরকম মতামত জ্ঞাপন করেছেন, "From the

[১০] Collett Cox, Disputed Dharmas Early Buddhist Theories of Existence, 1995, 37.

outset; all attempts to clarify these issues are complicated by the fact that the origin of the term 'Darstantikas' is interpreted differently by different commentators. K'Uei-Chi, whose opinion became definitive in the chinese and japanese commentarial traditions, suggests that it derives either from comparisons drstanta drawn between Kumarlata, the reputed founder of Darstantikas, and the light of the sun, or from the name of his text, the Drstantapankti."[১১] অর্থাৎ একজন প্রামাণ্য জাপানী ও চীনা ব্যাখ্যাকার বলেন 'দার্ষ্টান্তিক' শব্দটি হয় 'দৃষ্টান্ত' শব্দটি থেকে এসেছে, অথবা দার্ষ্টান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কুমারলতার বিখ্যাত গ্রন্থ **দৃষ্টান্তপঙ্‌ক্তি** থেকে এরূপ নামকরণ হয়েছে। আচার্য যশোমিত্রও বলেন — এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত ব্যবহার করার প্রচলন ছিল বলেই তাদের এই প্রকার নামকরণ করা হয়েছে। কাটো যেসকল গ্রন্থে দার্ষ্টান্তিক শব্দটির উল্লেখ আছে সেই গ্রন্থগুলিকে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করেছেন। প্রথমেই তিনি মহাবিভাষার উল্লেখ করেন। সেখানে তথ্যসূচীতে ছিয়াশিবার দার্ষ্টান্তিক শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় তার মধ্যে তারা পঁচিশটি জায়গায় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। এথেকে একথা স্পষ্ট যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে তারা অধিক পরিমানে দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতেন। যদিও তাদের এইপ্রকার আচরণের জন্য মহাবিভাষায় দার্ষ্টান্তিকদের সমালোচনা করা হয়েছে। যেহেতু তারা ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ ও সূত্রের ওপর নির্ভর করার তুলনায় দৈনন্দিন জাগতিক দৃষ্টান্তের ওপর বেশি নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করতেন। তারা ভগবান বুদ্ধদেবের আর্যসত্য সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করতেন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর ওপর তারা বেশি বিশ্বাস পোষণ করতেন। সুতরাং মহাবিভাষায় 'দার্ষ্টান্তিক' শব্দটি একটি অপমানসূচক বা ব্যঙ্গপূর্ণ নঞর্থক শব্দ যেটি কাশ্মীর সর্বাস্তিবাদীরা তাদের বিরোধীদের সম্বোধন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, যেহেতু তারা বুদ্ধের বাণীর প্রতি সংশয় প্রকাশ করতেন জাগতিক অবৈধ দৃষ্টান্তের ওপর নির্ভর করে।

অভিধর্মকোশভাষ্যেও সৌত্রান্তিক ও দার্ষ্টান্তিক এই উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। "As a result of these investigation Kato Corroborates the view of Jean Przyluski that the term Darstantikas and Sautrantikas simply represents different perspectives from with the same group can be seen: the term Darstantikas has a negative

[১১] Ibid., 37.

connotation and is used by opponents, such as the Kasmira Sarvastivadins, to suggest the group's reliance upon the invalid authority of conventional example; the term Sautratika has a positive connotation and is used by the group itself to refer to its own views."[১২]

কাটো সকল গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনার এবং পরীক্ষা করে দেখেন যে, দার্ষ্টান্তিক ও সৌত্রান্তিক শব্দটি একই সম্প্রদায়ের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দেশিত দুটি নির্দেশক শব্দ, দার্ষ্টান্তিক শব্দটির নঞর্থক নির্দেশনা রয়েছে, যেটি বিরোধী পক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ। কাশ্মীর সর্বাস্তিবাদীরা ব্যঙ্গপূর্বক এই নামটি ব্যবহার করতেন যেহেতু তারা বুদ্ধের বচনের প্রামাণ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতেন অবৈধ জাগতিক, চিরাচরিত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। বিপরীত দিকে সৌত্রান্তিক শব্দটি একটি সদর্থক শব্দ যেটি সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ সদস্যরা নিজেদের সম্পর্কে ব্যবহার করতেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথাই বোঝা যায় যে, সৌত্রান্তিকগণ বুদ্ধের সূত্র বা উপদেশকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করতেন। যেহেতু বুদ্ধদেব তাদের কাছে ছিল প্রমাণ। যেহেতু সুত্ত বা সূত্রের ওপর বেশি নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করতেন তাই তাদের সৌত্রান্তিক বলে আখ্যায়িত করা হতো। সঙ্ঘভদ্র দার্ষ্টান্তিক সম্প্রদায় থেকে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়কে পৃথক করেননি। সর্বোপরি, একথাই বলা যায় যে, দার্ষ্টান্তিক ও সৌত্রান্তিক শব্দ দুটি ভিন্ন কোনো সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে কিনা সে বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতানৈক্য থাকতে পারে। কিন্তু অনেক বিষয় পর্যালোচনা করার পর আমার মনে হয়েছে দুটি শব্দই একই সম্প্রদায়কেই নির্দেশ করে। পার্থক্য কেবল ব্যবহারকারীর, দার্ষ্টান্তিক শব্দটি বিরোধীপক্ষ সর্বাস্তিবাদ কর্তৃক ব্যবহৃত একটি শব্দ, আর সৌত্রান্তিক শব্দটি আত্মনির্দেশক শব্দ (যেখানে শব্দটি সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিজেদের চিহ্নিত করতে ব্যবহার করে)। দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীলাত, যার শিষ্য ছিলেন ভদন্ত রাম।

ভদন্ত রামের সত্তার লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা আমরা পাই না। কিন্তু তাঁর প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব এবং সংস্কৃত ধর্মের বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্রান্ত আলোচনায় সদ্‌বস্তুর প্রকৃতি কিরূপ হবে — এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যায়। আমি চেষ্টা করবো সেই আলোচনাটি করার মধ্য দিয়ে তার সত্তা সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করার।

[১২] Ibid., 39.

আচার্য সঙঘভদ্র অভিধর্মের মূল্যবান নীতিগুলিকে নিয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম হল **অভিধর্মন্যায়ানুসার**। এটি একটি বিতর্কিত গ্রন্থ, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সৌত্রান্তিকগণের হাত থেকে কাশ্মীর সর্বাস্তিবাদীদের মতকে রক্ষা করা। বসুবন্ধুর মূল প্রতিপক্ষ রূপে অভিধর্মকোশভাষ্যে সৌত্রান্তিকগণের নাম গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়েছে। সঙঘভদ্র বসুবন্ধুর এই প্রকার তথাকথিত 'সৌত্রান্তিক' অবস্থানকেও খন্ডন করেছেন। এছাড়াও বসুবন্ধুর পূর্বে যেসকল সৌত্রান্তিকগণ (সাধারণতঃ যাদের দার্ষ্টান্তিক মনে করা হয়) ছিলেন, যাদের নামোল্লেখ কোশে পাওয়া যায়নি, তাদের মতবাদকেও সঙঘভদ্র খন্ডন করেছেন।

সকল তথ্যসূচীতেই একথাই স্বীকৃত যে, সঙঘভদ্র হলেন একজন প্রখ্যাত কাশ্মীর সর্বাস্তিবাদী, যিনি আচার্য বসুবন্ধুর সমসাময়িক ছিলেন। আধুনিককালীন সকল গবেষক ও ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই এই বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন যে, দার্ষ্টান্তিক এবং সৌত্রান্তিকগণের উৎপত্তি একই মূল থেকে। বর্তমানকালের অনেক গবেষকই সঙঘভদ্রের পূর্বস্বীকৃতিকে কেন্দ্র করেই বলেন যে, সৌত্রান্তিক শব্দটি সম্প্রদায়ের সদস্যগণ ব্যবহৃত একটি সদর্থক ও আত্মনির্দেশক শব্দ, কিন্তু বিপরীতে দার্ষ্টান্তিক শব্দটি তাদের বিরোধী পক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ, যার একটি নঞর্থক অর্থ আছে। সঙ্গতভাবেই বিশ্বাস করা হতো যে, সৌত্রান্তিকগণের পূর্বসূরী ছিলেন দার্ষ্টান্তিকগণ, **বিভাষা** গ্রন্থে যাদের নামোল্লেখ আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল আচার্য বসুবন্ধুর সমসাময়িক সৌত্রান্তিক আচার্য ভদন্ত রামের সদ্‌বস্তুর বা অস্তিত্বশীল বস্তুর প্রকৃতি কিরূপ তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা। সঙঘভদ্রের অভিমত অনুসারে ভদন্ত রাম হলেন আচার্য শ্রীলাতের একজন শিষ্য। ভদন্ত রামের সময়কালটিকে উৎপত্তির দিক থেকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি শ্রীলাত এবং বসুবন্ধুর মধ্যবর্তী সময়ে অবস্থান করতেন। সুতরাং তার দার্শনিক যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা হয়তো কোনো নতুন মতবাদ পেতে পারি, যেখান থেকে দার্ষ্টান্তিক সৌত্রান্তিক ধারা এবং বসুবন্ধুর সৌত্রান্তিক মতবাদের মধ্যে যে তাত্ত্বিক ছেদ পড়েছিল তার সম্পর্কে কিছু তথ্য পাবো।

প্রথমেই এই প্রসঙ্গে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বটি এবং এই সংস্কৃত ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব ঃ

বসুবন্ধু প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দটির অন্তর্গত সমুৎপাদ শব্দের অর্থ করেন — উৎপাদাভিমুখ ভবিষ্যত ধর্মগুলি শর্ত বা প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে সমুদ্ভাব বা অস্তিত্বশীল হয়। সঙ্ঘভদ্র বসুবন্ধুকে সমালোচনা করে বলেন যে, বসুবন্ধু ভবিষ্যত ধর্মের সত্তা স্বীকার না করেও কীভাবে অনস্তিত্বশীল ভবিষ্যত ধর্মের শর্তপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাখ্যা দেন, তা অস্পষ্ট। ভদন্ত রাম তার মতামত ব্যক্ত করতে বলেন — "শব্দ নির্দেশনারূপ যে ক্রিয়া সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শব্দই নির্দিষ্ট কোনো অর্থকে নির্দেশ করে। সমুৎপাদ বা উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদি শব্দগুলি সংস্কারসন্তানের প্রত্যেকটি সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং এইসকল শব্দের অর্থগুলি অর্থের যে বিপুল পরিধি বর্তমান আছে তার থেকেই নিঃসৃত হয়। সমুৎপাদ কথাটি যদিও ক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না যেহেতু ক্ষণ অতিসূক্ষ্ম এবং তাকে অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। যদিও এইসকল শব্দ যখন সন্তানের ধারা বা প্রবাহের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে, তখন তারা একক্ষণের বা মুহূর্তের উপমা বা দৃষ্টান্তের ব্যবহার করে।"

রামের এই ধরণের ব্যাখ্যা সৌত্রান্তিকের মতের অনুরূপ। কোশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়নির্দেশের সঙ্গে প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ। ইন্দ্রিয়নির্দেশ অংশে সংস্কৃত ধর্মের তিনটি অথবা চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। 'সূত্র'কে অনুসরণ করে তারা তিনটি লক্ষণের কথা বলেন যথা — উৎপাদ, স্থিতি ও ব্যয়। পাশাপাশি সর্বাস্তিবাদীরা চারটি বৈশিষ্ট্যের বা লক্ষণের উল্লেখ করেছেন — যথা — জাতি, স্থিতি, স্থিত্যন্যথাত্ব এবং অনিত্যতা। বসুবন্ধু কোশে চারটি যে লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা আছে, তার সৌত্রান্তিক ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন - শর্তাধীন বা প্রত্যয়যুক্ত কোনো ঘটনার যে ধারা সেটি প্রথমে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার অনিত্যতাও চলে আসে, যেটি ঘটল বা উৎপন্ন হল সেটি সেইক্ষণে স্থিতিশীল এবং পরবর্তী মুহূর্তের যে সন্তানের ধারা তার সঙ্গে পূর্ববর্তী সন্তানের ধারার পার্থক্য আছে। যে সন্তানের ধারা সেটির ধারাবাহিকতার মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে।

বসুবন্ধুর মতে এই চারটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ সন্তানের ধারার ক্ষেত্রেই ব্যক্ত হয়েছে, একটি ক্ষণের জন্য নয়। এই মতবাদটি ভদন্ত রামের মতবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদি ক্ষণগুলিকে বিযুক্ত

সদ্‌বস্তু বা পদার্থরূপে না দেখি তাহলে সংস্কৃতধর্মের লক্ষণগুলি ক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। এটি ভদন্ত রামের দ্বিতীয় প্রকার অভিপ্রেত বিষয়। 'উৎপন্ন' কথাটি প্রযুক্ত হবে প্রত্যেকটি ক্ষণের ক্ষেত্রে যেটি সবে উৎপন্ন হল। 'ব্যয়' কথাটি বোঝায় যেটি অস্তিত্বশীল ছিল, কিন্তু বর্তমানে আর অস্তিত্বশীল নয়। ধারাবাহিকতা বা স্থিতি নির্দেশ করে প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধারার বস্তুর মধ্যেকার একটি সম্বন্ধকে। ধারার বা প্রবাহের পরিবর্তন নির্দেশ করে অসাদৃশ্যতা সেই সম্বন্ধের মধ্যে। চারটি বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র শর্তাধীন বস্তুর প্রবাহের ক্ষেত্রে নয় বরং প্রত্যেকটি ক্ষণের বস্তুর মধ্যেই থাকে।

প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের মূল সূত্র বা মৌলিক নীতি ঃ

বৌদ্ধদর্শনের একটি প্রসিদ্ধ মতবাদ হল প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ। প্রতীত্য শব্দের অর্থ হল 'কোনো কিছু অধীন থাকা এবং সমুৎপাদ শব্দের অর্থ হল 'উৎপন্ন হওয়া' - কাজেই প্রতীত্যসমুৎপাদ কথাটির অর্থ হল শর্তাধীনভাবে কোনো কিছুর উৎপন্ন হওয়া। এই প্রতীত্যসমুৎপাদ হল বৌদ্ধদর্শনের কার্যকারণ নিয়ম। এখানে বলা হয় জগতের সকল ঘটনাই অন্য ঘটনার অধীন, ফলতঃ সবকিছুই শর্তসাপেক্ষ হওয়ায় তা অনিত্য। প্রত্যেকটি ঘটনাই পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে উৎপন্ন হয়, আবার পরবর্তী ঘটনাকে উৎপন্ন করে বিলুপ্ত হয়। সুতরাং দুটি ক্ষণের বস্তু যেমন সম্পূর্ণ এক নয়, তেমনি আবার সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়। তাদের মধ্যে এক প্রকার সাদৃশ্য থাকে। প্রত্যেকটি ক্ষণের বস্তু স্বলক্ষণযুক্ত। এক বস্তুর লক্ষণ বা ধর্ম অন্য বস্তুতে নেই।

এখানে ভদন্ত রামের মূল বক্তব্য কি, সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। "কোনো কিছু উৎপত্তি হয় কেন — এই প্রসঙ্গে দুটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি আছে।" "যখন 'ক' অস্তিত্বশীল হয়, তখন 'খ' অস্তিত্বশীল হয়।" 'ক' এর উৎপত্তির ওপর নির্ভর করে 'খ' উৎপন্ন হয়। আচার্য সঙ্ঘভদ্রের মতে, প্রতীত্যসমুৎপাদের এই দুটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি সত্ত্বাখ্য ও অসত্ত্বাখ্য বস্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় যদিও প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বাদশ নিদান যেহেতু নির্ভর করে আছে মূল কারণ অবিদ্যার ওপর, সেই কারণে মূলতঃ তা সত্ত্বাখ্য বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়।

ভদন্ত রাম এই বিষয়ে বহু ক্ষেত্রে শ্রীলাতের (গুরুর) অভিমতকে অমান্য করেছেন এবং নিজ মতবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্যটি নিম্নে উল্লেখ করা হল —

"Bhadanta Rama, who is not content to accept the explanation of his own teacher, also offers another interpretation of his own: (a) if it is permissible for the twelve members to be classified into three lifetimes, then [this opening formula] would be the summary of the teaching of dependent origination over the course of three lifetimes: "when this (i.e., the former life) exists, that (the present life) exists, and, from the arising of this (present life), that (future life) arises"; (b) if it is not permissible, then these two phrases should indicate immediate and mediate causation respectively."[১৩]

অর্থাৎ (a) যদি দ্বাদশ নিদানকে তিনটি জীবনের (পূর্ব জীবন, বর্তমান জীবন, ভবিষ্যত জীবন) মধ্যে বিভক্ত করা হয়, তাহলে প্রতীত্যসমুৎপাদের সূত্রটিকে তিনটি জীবনের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে — যখন পূর্ব জীবন অস্তিত্বশীল হয় তখন সেই পূর্ব জীবনের ওপর নির্ভর করে বর্তমান জীবন অস্তিত্বশীল হয়। এবং বর্তমান জীবনের ওপর ভবিষ্যত জীবনের উৎপত্তি বা অস্তিত্ব নির্ভর করে। (b) দ্বিতীয় সম্ভাবনাটির ক্ষেত্রে তিনি বলেন, যদি (a)-এর প্রতিপাদ্য বিষয়টি অনুমোদনযোগ্য না হয়, তাহলে বলতে হবে, দুটি সূত্র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণকে নির্দেশ করে।

রাম দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। প্রথম মতবাদটি অর্থাৎ (a)-এর বক্তব্যটি সর্বাস্তিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত, যেখানে প্রতীত্যসমুৎপাদকে "three lifetimes with twofold causation"-এর মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুটি কারণ হল যথাক্রমে পূর্ববর্তী জীবন যা বর্তমান জীবনের কারণ, আবার বর্তমান জীবন ভবিষ্যত জীবনের কারণ। দ্বিতীয় বক্তব্যটি (b)-এর বিষয়টি তাদের জন্য যারা সর্বাস্তিবাদের বক্তব্য মানেন না, অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদকে জীবনচক্রের (life-time) সংখ্যা দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, একথাই তিনি বলছেন। যোগাচার দর্শনে দুটি জীবনচক্র এবং একটি কার্যকারণ সম্পর্ক মানা হয়েছে। এই প্রকার দ্বিবিধ সম্ভাবনা বা ব্যাখ্যাই ভদন্ত রামের বক্তব্যে পাওয়া যায়।

বসুবন্ধু অভিধর্মকোশ গ্রন্থে রামের মতামতকেই প্রচ্ছন্নভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, "ভগবান বুদ্ধদেব প্রতীত্যসমুৎপাদকে দুটি মূল সূত্রে দেখেছিলেন, যখন A অস্তিত্বশীল হয় তখন B অস্তিত্বশীল হয়, B-এর উৎপত্তি A-এর ওপর নির্ভর করে। (a) অবিদ্যা থেকে সংস্কারের উৎপত্তি

[১৩] Takumi Fukuda, "Bhadanta Rama. A Sautrantika before Vasubandhu", 2003, 269.

হয়, অবিদ্যা হল সংস্কারের প্রত্যক্ষ কারণ, 'অবিদ্যা ব্যতিরেকে' কখনও সংস্কার উৎপন্ন হতে পারে না। অবিদ্যা হল নির্দিষ্ট কারণ সংস্কারের ক্ষেত্রে, এবং পরবর্তী অংশে বলা হচ্ছে - অবিদ্যা ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। (b) অবিদ্যা অস্তিত্ব সংস্কারের অস্তিত্বের কারণ, আবার সংস্কারের উৎপত্তির ওপরই বিজ্ঞানের উৎপত্তি নির্ভর করে। এইভাবে দ্বাদশ নিদানের মধ্যে একটি পারম্পর্য দেখা যায়। (c) জীবনচক্রকে নির্দেশ করার সময় একইভাবে বলেছেন - পূর্ববর্তী জীবন অস্তিত্বশীল হলে বর্তমান জীবন অস্তিত্বশীল হয়, বর্তমান জীবনের অস্তিত্বের ওপর ভবিষ্যত জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে। (d) অথবা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যেতে পারে — কোনো ক্ষেত্রে সংস্কার হয়তো অবিদ্যার তৎক্ষণাৎ পরেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু অন্যক্ষেত্রে হয়তো তৎক্ষণাৎ নাও উৎপন্ন হতে পারে।" (Takumi Fukuda, "Bhadanta Rama: A Sautrantika before Vasubandhu", pp. 270)

বসুবন্ধুর প্রতীত্যসমুৎপাদের চারটি ব্যাখ্যার মধ্যে শেষের দুটি মতবাদ ভদন্ত রামের মতবাদের সঙ্গে অনুরূপ। ব্যাখ্যাকারগণ শেষের দুটি বর্ণনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যখন অবিদ্যা সরাসরি সংস্কার উৎপন্ন করে তখন তা সংস্কারের প্রতি প্রত্যক্ষ কারণ, কিন্তু যখন অবিদ্যা থেকে সরাসরি সংস্কার উৎপন্ন হয় না, তখন তা পরোক্ষ কারণ।

ভদন্ত রামের সত্তার লক্ষণ সম্পর্কে আমরা সরাসরি কোনো মতবাদ দেখতে পাই না। তবে তার অস্তিত্বসংক্রান্ত মতবাদ দেখে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি একজন সৌত্রান্তিক মতাবলম্বী।

ভদন্ত রাম গতি অস্বীকার করেছেন। প্রত্যেকটি বস্তু প্রত্যয় বা শর্তযুক্ত হওয়ার পরেই অস্তিত্বশীল হয় এবং বস্তু তার পরমুহূর্তেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সেইস্থলেই বস্তু বিনষ্ট হয় যেস্থলে বস্তু উৎপন্ন হয়েছিল। এবং অন্যস্থানে বস্তু স্থানান্তরিত হতে পারে না। এক ক্ষণে বস্তু শর্ত বা প্রত্যয়যুক্ত হয়ে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, পরক্ষণেই তা অনস্তিত্বে পর্যবসিত হয়। বস্তু একক্ষণের বেশি স্থায়ী হয় না। আপাতভাবে আমরা ভাবি বস্তুর মধ্যে স্থানান্তর ঘটছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো গতি নেই।

ভদন্ত রামের গতিসংক্রান্ত বক্তব্যটি নিম্নে বলা হল —

“Bhadanta Rama gives his opinion: The Stream of Conditioned factors, by attaining its existence, arises at a certain place and then goes out of existence at that very place. Therefore, there is no movement.”[14]

অর্থাৎ তার গতি সম্পর্কে বক্তব্যটি খুব সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট - ঘটনার ধারা বা প্রবাহ যখনই নিজ অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়ে যায়, নির্দিষ্ট স্থলে উৎপন্ন হয়, সেইস্থলেই তার অস্তিত্ব বা সত্তাও বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সেখানো কোনো গতি নেই।

উপরিউক্ত সকল আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, ভদন্ত রামের অস্তিত্বের ধারণা সৌত্রান্তিক মতের অনুরূপ। কারণ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বস্তুর একক্ষণ স্থায়িত্বই নিঃসৃত হয়েছে। এবং যেক্ষণে বস্তু উৎপন্ন হয় তার পরক্ষণেই বস্তু বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এথেকে বোঝা যায় সদ্‌বস্তু একক্ষণে অস্তিত্বশীল। এবং তা অপর বস্তুকে উৎপন্ন করে বিনষ্ট হয় (অর্থক্রিয়াসামর্থ্য বিশিষ্ট)। সুতরাং এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সত্তার লক্ষণটিও তারা সৌত্রান্তিক দার্শনিকদের ন্যায় প্রদান করবেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সৌত্রান্তিক আচার্য ধর্মকীর্তির সত্তার ধারণাটি ব্যক্ত করেছি।

[১৪] Ibid., 281.

তৃতীয় অধ্যায়

সৌত্রান্তিক আচার্য ধর্মকীর্তির মতে সত্তার লক্ষণ

গবেষণামূলক প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে আমি সৌত্রান্তিক দর্শনের সত্তার লক্ষণ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো এবং সেখানে সত্তার আলোচনার সম্পূর্ণতার খাতিরে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও (প্রমাণের স্বরূপ, প্রত্যক্ষের লক্ষণ, প্রত্যক্ষের বিষয়, স্বলক্ষণের স্বরূপ এবং সর্বোপরি ক্ষণিকত্ববাদ) আলোচনা করতে প্রয়াসী হবো। মূল আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে সৌত্রান্তিক দর্শন সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। সৌত্রান্তিক দর্শন বস্তুবাদী দর্শন, অর্থাৎ এই দর্শনে বাহ্য ও আন্তর এই দুপ্রকার বস্তুর মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বৈভাষিকগণের সঙ্গে তাদের দর্শনের মূল পার্থক্য হল, বৈভাষিকগণ বলেন বাহ্য ও আন্তর এই দুই প্রকার বস্তুর জ্ঞান আমরা সাক্ষাতভাবে বা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানতে পারি। সৌত্রান্তিকগণ বৈভাষিকদের ন্যায় মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তার জ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারা লব্ধ একথা তারা স্বীকার করেন না। সৌত্রান্তিকগণ মনে করেন, জ্ঞান ছাড়াও বাহ্যবস্তুর পৃথক অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বাহ্যবস্তু সরাসরি প্রত্যক্ষিত হয় না। যেহেতু বস্তু জ্ঞানে আবির্ভূত বা প্রতিভাসিত হয়, অতএব অনুমান করতে হয় যে বাহ্য কোনো বস্তু অবশ্যই বর্তমান আছে, যার জন্য জ্ঞানের মধ্যে এমন প্রতিভাস সম্ভব হচ্ছে। তাই তাদের মতে, বাহ্যবস্তুর জ্ঞান অনুমানলব্ধ, সৌত্রান্তিকগণের এইরূপ মতবাদের জন্য তারা বাহ্যানুমেয়াদী হিসাবে দার্শনিক সমাজে পরিচিত। এছাড়াও বৈভাষিকগণের সঙ্গে সৌত্রান্তিকগণের মূল পার্থক্য হল — বৈভাষিকগণ সর্বাস্তিবাদী, কিন্তু সৌত্রান্তিকগণ ক্ষণিকত্ববাদী। বৈভাষিক মতে, সংস্কৃত ধর্মমাত্রেরই ত্রিকাল অস্তিত্ব অর্থাৎ অনাগত, বর্তমান ও অতীত কালে অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সৌত্রান্তিকগণ সংস্কৃত ধর্মমাত্রেরই তিনকালে অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাদের মতে সদ্‌বস্তু ক্ষণিক, এবং বর্তমান ক্ষণই কেবলমাত্র সৎ। জগতের প্রতিটি বস্তু এক ক্ষণের জন্য স্থায়ী, কোনো বস্তু এক ক্ষণের বেশি স্থায়ী হয় না। ক্ষণকে কালের অবিভাজ্য অতি সূক্ষ্মতম অংশ বলা হয়। যা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয়। প্রতি ক্ষণের বস্তুতে সামান্য লক্ষণ বা সমান ধর্ম বলে কিছু নেই, আছে কেবল স্বলক্ষণ। বস্তু হল এই স্বলক্ষণের প্রবাহ। আমরা সবিকল্পক জ্ঞানে বস্তুতে সামান্য ধর্মের অধ্যবসায় করে তাকে স্থির দ্রব্য রূপে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এরূপ সামান্য লক্ষণ পরমার্থসৎ নয়। স্বলক্ষণ বস্তুই

হল সৌত্রান্তিক মতে পরমার্থসৎ। এই স্বলক্ষণ বস্তুর স্বভাব হল অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্টতা। অর্থাৎ কার্যোৎপাদন সামর্থ্য। যে বস্তুর কার্যোৎপাদন সামর্থ্য আছে, তাই সৎ, আর যে বস্তু কার্যোৎপাদন সামর্থ্য নেই, তা অসৎ। সৌত্রান্তিক দর্শনের আচার্যগণ ধর্মকীর্তি, অশ্বঘোষ, রত্নকীর্তি প্রভৃতিরা এই অর্থক্রিয়াকারিত্বকে (সত্তার লক্ষণ) হেতু করে ক্ষণিকত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ নয়। অতএব, সৌত্রান্তিকগণ বস্তুর ক্ষণিক স্বভাবকে প্রতিষ্ঠা করতে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ফলতঃ বৈভাষিকগণের তুলনায় সৌত্রান্তিকগণ তাদের দার্শনিক বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে অনেক বেশি যৌক্তিক প্রক্রিয়া বা ন্যায়ের ওপর নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করেছেন।

এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে যথাক্রমে সর্বাস্তিবাদসম্মত কালিকতার প্রকারভেদের ধারণা কীভাবে সত্তার মানদণ্ড হিসাবে উঠে এসেছে তা দেখেছি, এবং সত্তার ধারণায় 'কারিত্র' কীভাবে বিভিন্ন সর্বাস্তিবাদী দার্শনিক কর্তৃক পরিমার্জিত হয়েছে তাও সবিচার আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বাস্তিবাদী সঙঘভদ্র এবং সৌত্রান্তিক আচার্য ধর্মকীর্তির মধ্যবর্তী দার্ষ্টান্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত ভদন্ত রামের সত্তা বিষয়ক ধারণার ঈষৎ আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়টির আলোচনা এই কারণেই প্রয়োজনীয় কেননা, আচার্য ধর্মকীর্তির সময়কাল আচার্য সঙঘভদ্র এবং আচার্য বসুবন্ধুর অনেক পরে, সেইজন্যই আলোচনার মধ্যে কোথাও যাতে ছেদ না পড়ে, সেইজন্যই ধারাবাহিকতার প্রয়োজনে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দার্ষ্টান্তিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছি।

বর্তমান অধ্যায়ে সৌত্রান্তিক দর্শনের সত্তার আলোচনাটি আমরা পরবর্তী সৌত্রান্তিক আচার্য ধর্মকীর্তির মতানুসরণ করেই করবো। আচার্য ধর্মকীর্তির সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। আচার্য ধর্মকীর্তির দার্শনিক অবস্থান সম্পর্কে বৌদ্ধসমাজে একটি মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। তিনি তাঁর **ন্যায়বিন্দু** গ্রন্থে কখনও যোগাচার পক্ষ অবলম্বন করে কোনো দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন আবার কখনও সৌত্রান্তিক পক্ষ অনুযায়ী কোনো দর্শনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু এসকল মতানৈক্যের পরেও তাঁকে একজন সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের পুরোধা হিসাবেই দার্শনিক মহলে গণ্য করা হয়।

আচার্য ধর্মকীর্তির পরিচয় প্রদান এবং তার স্বরচিত গ্রন্থাবলীর বিবরণ ঃ-

বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তির সময়কাল হল আনুমানিক ৬০০-৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ্যের ত্রিমলয় নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তিনি ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়কে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তাই সকল আস্তিক দর্শনেই ধর্মকীর্তির দর্শন ভাবনার কমবেশি উল্লেখ আছে এবং তারা প্রায় প্রত্যেকেই ধর্মকীর্তির বক্তব্যকে খণ্ডন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কারণ ধর্মকীর্তির সকল বক্তব্যই ন্যায়ানুসারী। ভারতীয় দর্শনে ধর্মকীর্তিকে একজন সবল পূর্বপক্ষী হিসাবে উল্লেখ করলে তা দোষের হবে না।

আচার্য দিঙনাগ শিষ্য ঈশ্বরসেনের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘস্থবির আচার্য ধর্মপালের শিষ্যরূপে নিযুক্ত হন। ধর্মকীর্তি সর্বমোট সাতটি বৌদ্ধন্যায়ের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এবং গ্রন্থগুলি দর্শনের জগতে এক একটি অমূল্য সম্পদ বললে অত্যুক্তি হবে না। সেগুলি হল — (১) **প্রমাণবার্তিক**, (২) **প্রমাণবিনিশ্চয়**, (৩) **ন্যায়বিন্দু**, (৪) **হেতুবিন্দু**, (৫) **সম্বন্ধপরীক্ষা**, (৬) **বাদন্যায়**, (৭) **সন্তানন্তরসিদ্ধি**। এছাড়াও প্রমাণবার্তিকের স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদ এবং সম্বন্ধপরীক্ষার ওপর তিনি বৃত্তি রচনা করেন। উপরিউক্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ধর্মকীর্তির শ্রেষ্ঠ ও আকর গ্রন্থ হল প্রমাণবার্তিক। প্রমাণবার্তিকের ওপর প্রজ্ঞাকরগুপ্তের প্রমাণবার্তিকালঙ্কার টীকার সংস্কৃত মূল পাওয়া গেছে। এছাড়াও মনোরথ নন্দীরও একটি টীকা রয়েছে। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন তিব্বত থেকে প্রমাণবার্তিকের মূল সংস্কৃত সংস্করণ উদ্ধার করে শুধু বৌদ্ধধর্মেরই নয় বরং ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের উপকার সাধন করেছেন।

প্রমাণবার্তিক গ্রন্থটির অধ্যায় বিভাজন ঃ

ধর্মকীর্তি বিরচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুচর্চিত গ্রন্থটি হল প্রমাণবার্তিক। এটি কারিকাতে লিখিত, কারিকা সংখ্যা হল ১৪৫৪, দিঙনাগের প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থের ওপর ধর্মকীর্তির বার্তিক বা ব্যাখ্যাই হল প্রমাণবার্তিক গ্রন্থটিতে সর্বমোট চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে যথা — প্রমাণসিদ্ধি, প্রত্যক্ষ, স্বার্থানুমান, পরার্থানুমান, যদিও এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বিভাজনের ক্রম নিয়ে একটি দ্বন্দ্ব বা মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু দিঙনাগের প্রমাণসমুচ্চয়ের ওপর প্রমাণবার্তিক রচিত হয়েছে স্বভাবতঃই গ্রন্থের ক্রমটিও সেখান থেকেই নিঃসৃত। প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থের মোট ছয়টি

অধ্যায় যথা — (১) প্রত্যক্ষপরীক্ষা, (২) স্বার্থানুমান, (৩) পরার্থানুমান, (৪) দৃষ্টান্তপরীক্ষা, (৫) অপোহপরীক্ষা, (৬) জাতিপরীক্ষা। প্রথম তিনটি অধ্যায় প্রমাণবার্তিক গ্রন্থের অধ্যায়ের অনুরূপ, অবশিষ্ট তিনটি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তু ধর্মকীর্তি তাঁর সমগ্র গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন। তবে ধর্মকীর্তি প্রমাণসিদ্ধি ইত্যাদি রূপে গ্রন্থের ক্রম বিভাজন করলেও তিনি স্বার্থানুমানের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্বার্থানুমানের ওপর তাঁর স্বরচিত বৃত্তিতে তিনি লেখেন যে, স্বার্থানুমানই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হওয়া উচিত। প্রত্যক্ষের তুলনায় তিনি অনুমানের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় দর্শনে যুক্তি বলতে অনুমানকেই বোঝা হয়। এবং ধর্মকীর্তি নিঃসন্দেহে একজন ভারতীয় যুক্তিবিদ্। ফলতঃ অনুমানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করবেন, এটাই স্বাভাবিক, তিনি একথাও বলেন যে, অনুমানই ব্যবহারিক জীবনে অর্থকে অনর্থ থেকে পৃথক করতে সাহায্য করে। প্রমাণবার্তিকের ওপর ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দু ও প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থ দুটি রচনা করেন।

<u>প্রমাণবার্তিকের চারটি পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়</u> ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ প্রমাণসিদ্ধিতে ধর্মকীর্তি ভগবান বুদ্ধদেবকে প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছেন। ভগবান বুদ্ধদেব জাগতিক দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য মানুষকে পথ দেখান। তিনি চারটি আর্যসত্যের বা মহানসত্যের উপদেশ দেন, তাই তিনি হলেন যথার্থ প্রমাণ এবং জাগতিক জীবের পথ প্রদর্শক। কিন্তু এক্ষেত্রেও আচার্য ধর্মকীর্তি বলেন, অনুমানের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা কোন্‌টা আর্যসত্য সেটা সম্যকভাবে জানতে ব্যর্থ হবো, তাই প্রাথমিক প্রয়োজন হল অনুমানের স্বরূপ এবং প্রামাণ্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান। তাই প্রমাণবার্তিক গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ স্বার্থানুমান হওয়া উচিত বলে ধর্মকীর্তি মত প্রকাশ করেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, অনুমানের স্বরূপ নিরুপন ধর্মকীর্তির নিকট প্রধান প্রয়োজন, কারণ তার স্বরূপ নিরুপন ব্যতীত ভগবান বুদ্ধের প্রামাণ্য ও সিদ্ধ নয়। তবে প্রমাণসিদ্ধি পরিচ্ছেদটিকে তিনি তাঁর পরবর্তী সকল গ্রন্থ থেকেই বাদ দিয়েছেন। কারণ পরম সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেব সকল প্রকার দেশ, কাল ও অনুভবের অতীত হওয়ায় তাঁর সম্পর্কে কোনো যৌক্তিক জ্ঞান সম্ভব নয়। তাঁর মতে, অনুভবের গণ্ডীর মধ্যেই যৌক্তিক জ্ঞান সম্ভব। অনুভবের গণ্ডীর বাইরে বা অতিবর্তী জগতে যৌক্তিক জ্ঞান অসম্ভব। সুতরাং সর্বজ্ঞ, পরম করুণাময় বুদ্ধদেব সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত করে চিন্তাও করতে সক্ষম নই।

প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে তিনি প্রমাণের স্বরূপ, প্রমাণের সংখ্যা, প্রত্যক্ষের লক্ষণ, প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের গ্রাহ্য বিষয় এবং প্রমাণ ও প্রমাণফল যে এক তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান পরিচ্ছেদে অনুমানের স্বরূপ, স্বার্থানুমানের স্বরূপ, লিঙ্গের স্বরূপ ও প্রকারভেদ, ব্যাপ্তিসম্পর্ক, হেত্বাভাস ইত্যাদি আলোচনা করেছেন।

সদ্‌বস্তু কাকে বলে? বা সদ্‌বস্তুর ধর্ম কি? অর্থাৎ সত্তার উপযুক্ত লক্ষণ কি? এই বিষয়ে যথাযথ উত্তর পেতে গেলে ধর্মকীর্তির জ্ঞানতত্ত্বের সম্পর্কে আমাদের ঈষৎ জানতে হবে। কারণ তাঁর দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং যথাযথভাবে সত্তার লক্ষণ বুঝতে গেলে ধর্মকীর্তি প্রদত্ত প্রমাণের লক্ষণ ও প্রত্যক্ষের লক্ষণ পূর্বে জানা প্রয়োজন। কেননা ধর্মকীর্তির সত্তার বর্ণনাটি সম্পূর্ণরূপে তার প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। যেহেতু প্রত্যক্ষেই আমরা স্বলক্ষণ বস্তুকে জানতে পারি এবং স্বলক্ষণ বস্তুর স্বভাব বা স্বরূপ হল অর্থক্রিয়াকারিত্ববিশিষ্ট হওয়া (যা সত্তার লক্ষণ) তাই প্রত্যক্ষের বর্ণনা ব্যতিরেকে সত্তার বর্ণনা করা নিরর্থক এবং অসম্পূর্ণ। তাই এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক ও অর্থপূর্ণ। এক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ন্যায়বিন্দু গ্রন্থকেও ক্ষেত্রেবিশেষে অনুসরণ করবো।

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

ধর্মকীর্তি বিরচিত ন্যায়বিন্দু হল একটি প্রকরণ গ্রন্থ। গ্রন্থ রচনার প্রকারভঙ্গি অনুসারে গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে। যেমন — কোনো গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিত, কোনো গ্রন্থ কেবল ভাষ্য আকারে আকর কিছু কিছু গ্রন্থ বৃত্তি আকারে, আবার কিছু কিছু গ্রন্থ টীকাসহ রচিত। যেমন — গৌতমের ন্যায়সূত্র, বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য, প্রজ্ঞাকরগুপ্ত ও মনোরথ নন্দীর প্রমাণবার্তিকের ওপর বৃত্তি, ইত্যাদি উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। সেইরূপ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থটিকে শাস্ত্রে প্রকরণের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রকরণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয় —

"শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ।।"

অর্থাৎ যে গ্রন্থে সমগ্র শাস্ত্রে আলোচিত বহু বিষয়ের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে নির্বাচন করে নিয়ে সেই বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়, সেই গ্রন্থকে প্রকরণ গ্রন্থ বলা হয়। ন্যায়বিন্দুকে প্রকরণ গ্রন্থ বলার সার্থকতা এখানেই যে, সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রের বহুবিধ আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সম্যক জ্ঞান হল একটি অংশমাত্র, সেই সম্যক জ্ঞানেরই সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। তাই এই গ্রন্থটি যথার্থই একটি প্রকরণ গ্রন্থ এবং গ্রন্থটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত যথা —প্রত্যক্ষ, স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান।

আচার্য ধর্মকীর্তি তাঁর ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রথম সূত্রে বলেন যে, "সম্যগ্‌জ্ঞানপুর্বিকা সর্বপুরুষার্থ সিদ্ধিরিতি তদ্ বুৎপাদ্যতে ।১।।"[১৫] অর্থাৎ যেহেতু সম্যক জ্ঞান পূর্বে থাকলে তবেই সকল প্রকার পুরুষার্থসিদ্ধি হয়, তাই সেই সম্যক জ্ঞানেরই নিরুপণ বা ব্যুৎপাদনই ধর্মকীর্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রয়োজন। বৌদ্ধদর্শনে এই সম্যক জ্ঞানই প্রমাণ। ধর্মকীর্তি তাঁর এই প্রথম সূত্রের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার একটি প্রসিদ্ধ রীতির পরিচয় দেন। সেটি হল অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের উল্লেখ। অনুবন্ধ হল অনু পশ্চাৎ স্বজ্ঞানোওরং বধ্নন্তি আসঞ্জয়তি প্রবর্তয়ন্তি ইতি অনুবন্ধাঃ। অর্থাৎ যেসকল জিনিস জ্ঞাত হলে পাঠক সহজেই গ্রন্থপাঠে আকৃষ্টবোধ করে বা প্রবৃত্ত হয় তাই হল অনুবন্ধ। এই অনুবন্ধ চারটি হল বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ, অধিকারী। অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের জ্ঞানের আবশ্যকতা তাই প্রত্যেক ভারতীয় দার্শনিকই কম-বেশি অনুভব করেন।

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থেরও অনুবন্ধ চতুষ্টয়গুলি প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য বিষয় হল যথার্থ জ্ঞান, গ্রন্থের প্রয়োজন হল যথার্থ জ্ঞানের ব্যুৎপাদন করা, যেহেতু সম্যক জ্ঞানের প্রতি সকল প্রকার পুরুষার্থসিদ্ধি হেতু। সম্বন্ধ দু'রকমের হতে পারে। বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থের এবং গ্রন্থের সঙ্গে প্রয়োজনের সম্বন্ধ। বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক সম্বন্ধ বর্তমান। প্রতিপাদ্য হল বিষয়, আর প্রতিপাদক গ্রন্থ। আর গ্রন্থ দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তাই গ্রন্থটি হল উপায়। সর্বশেষ অনুবন্ধটি হল অধিকারী, সকল ব্যক্তিই এই গ্রন্থপাঠে অধিকারী নয়। যার পুরুষার্থসিদ্ধি রূপ প্রয়োজন আছে এবং ইচ্ছা আছে সেইসকল ব্যক্তিই এই গ্রন্থপাঠের ক্ষেত্রে অধিকারী রূপে বিবেচিত।

---

[১৫] সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ, ন্যায়বিন্দু, ২০০৭, ১।

প্রমাণের লক্ষণ ও তার স্বরূপ বর্ণনা ঃ

বৌদ্ধদর্শনে সম্যক জ্ঞানকেই প্রমাণ বলা হয়। এখানেই ন্যায়দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ন্যায়দর্শনে প্রমার করণ, যার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই প্রমাণ। ফলতঃ প্রমাণের স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ নয়। কিন্তু বৌদ্ধগণ যথার্থ জ্ঞানকেই প্রমাণ বলছেন, "কারণ বৌদ্ধ বলেন যে, জ্ঞানেরই একটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জ্ঞানটিই বস্তুর সঠিক পরিমাপক হয়।"[১৬]

ধর্মকীর্তি তাঁর ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে প্রমাণের কোনো সামান্য লক্ষণ প্রদান করেননি। কিন্তু প্রমাণবার্তিক গ্রন্থে ধর্মকীর্তি প্রমাণের লক্ষণ সম্পর্কে বলেন — 'প্রমাণম্ অবিসংবাদি জ্ঞানম্।" অবিসংবাদি যে জ্ঞান তাই প্রমাণ। অবিসংবাদক ও সংবাদক একই কথা। সাধারণভাবে ব্যবহারিক জীবনে আমরা সংবাদক তাকেই বলি, যার কথার দ্বারা চালিত হলে আমরা যথার্থ অর্থ পাই। যেমন ধরা যাক রাম শ্যামকে যদি বলে আজ অমুক জায়গায় হাট বসেছে। শ্যাম যদি প্রকৃতই সেখানে উপস্থিত হয়ে হাট বসেছে তা দেখতে পায় তাহলে রামকে সংবাদক বলা যায়। রাম উপদর্শিত অর্থকে (হাট) পাইয়ে দিতে সক্ষম হয় বলে সে সংবাদক। উপদর্শিত বলার অর্থ হল শ্যামের কাছে। 'হাট' সাক্ষাতভাবে দর্শিত (দেখেন) হয়নি, রাম তার মনে 'হাট' বিষয়টিকে উপদর্শিত হতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে জ্ঞানকেও এরূপ অবিসংবাদক বলা হয়। কেননা জ্ঞানও বস্তুকে বা উপদর্শিত অর্থকে প্রাপ্ত হতে সাহায্য করে। জ্ঞানের মধ্যে অর্থটার স্পষ্ট ছবি বা অর্থের আকারকে প্রদর্শন করায়। এরপর ব্যক্তি সেই অর্থকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রবৃত্ত হয় এবং অর্থ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে প্রাথমিক যে জ্ঞান সেটি সংবাদক হয়।

এই অবিসংবাদকতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনোরথ নন্দী তাঁর প্রমাণবার্তিকের বৃত্তিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্মকীর্তি বলেন — "অর্থক্রিয়াস্থিতিঃ অবিসংবাদনম্।" জ্ঞানের মধ্যে যে বস্তুটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে, সেই বস্তুর যে ক্রিয়া, সেটি জ্ঞানের মধ্যে প্রতিভাসিত হলেই তাকে প্রমাণ বা অবিসংবাদন বলা যাবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রমাণ বলা যাবে কোনো জ্ঞানকে যদি তা অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর প্রতীতি ঘটায়। এইরূপ জ্ঞানই বস্তুর প্রাপক হয়। অর্থাৎ সদ্ বস্তু (অর্থক্রিয়াসামর্থ্যবান) প্রকাশক হলেই জ্ঞান অবিসংবাদক বা প্রমাণ হয়। ধরা যাক্, আগুনের যে

[১৬] তদেব., ২৯.

দহনরূপ অর্থক্রিয়ার জ্ঞান তা হলেই জ্ঞানটি প্রমাণ হবে। এই অর্থক্রিয়াস্থিতিই হল প্রমাণযোগ্যতা, যেটি থাকলে জ্ঞানকে তবেই প্রমাণ রূপে উল্লেখ করা যায়। এই অর্থক্রিয়া আবার দু'ধরণের। এক, যখন অর্থক্রিয়ার আকার জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যখন প্রকৃতপক্ষে অর্থক্রিয়ার অনুভব হয় সেটি অর্থক্রিয়ানির্ভাস প্রত্যক্ষ। অর্থক্রিয়ানির্ভাস প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বস্তুপ্রদর্শক যে জ্ঞান তার প্রামান্য নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ একারণেই বৌদ্ধরা পরতপ্রামাণ্যবাদী। যেমন আগুনের প্রতিভাস জ্ঞানে হওয়ার পরই আগুনের জাজ্বল্যমান রূপের (আগুনের কার্যকারিতার) স্পষ্ট প্রতিভাস হওয়ার পরই যদি দাহের স্পষ্ট অনুভব (অর্থক্রিয়ানির্ভাস প্রত্যক্ষ) হয়, তাহলেই পূর্বের আগুনের জাজ্বল্যমান জ্ঞানটি সংবাদক হয়েছে একথা প্রমাণিত হবে।

অর্থাৎ একটি জ্ঞানেরই তিনটি ভূমিকা বৌদ্ধরা স্বীকার করেন, একই জ্ঞান বস্তুর প্রদর্শক (অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুকে প্রদর্শন করায় সেটি সাক্ষাতভাবে হোক অথবা পরম্পরায় হোক), অর্থাৎ জ্ঞানে বস্তুর প্রতিভাস ঘটায়, দ্বিতীয়ত, সেই জ্ঞানই প্রবর্তক, অর্থাৎ প্রমাণ বস্তুকে প্রবৃত্তির বিষয়রূপে প্রদর্শন করায়। সুতরাং প্রবর্তকত্ব কথার অর্থ হল প্রবৃত্তিবিষয়প্রদর্শকত্ব। এবং তৃতীয়ত, জ্ঞান বা প্রমাণ প্রাপক হয়, প্রবৃত্ত হওয়ার পর ব্যক্তি সেই বিষয়টি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং একই জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা বা ক্রিয়া দেখা যায়। এখানে অবিসংবাদক শব্দের অর্থ অবিপরীত করলে যোগাচার মতে প্রমাণের উপরিউক্ত লক্ষণ সম্ভব হবে না। যেহেতু যোগাচার সম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদী তাই বিজ্ঞানই একমাত্র তাদের কাছে পরম সৎ। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বা সত্তা তারা স্বীকার করেন না। তাদের মতে যা কিছুই জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয় সবই ভ্রান্ত এবং বিপরীত। ফলে অবিপরীত জ্ঞানকে সম্যক জ্ঞান বললে যোগাচার মতে প্রমাণের এরূপ লক্ষণ সঙ্গত হবে না। তাই অর্থক্রিয়াস্থিতিই অবিসংবাদকের অর্থ।

প্রমাণের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল অনধিগতবিষয়কত্ব। অর্থাৎ যে বস্তু অধিগত বা জ্ঞাত হয়নি, পূর্বে, সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ নতুন বিষয় বা প্রথম বস্তুটি যখন জ্ঞাত হয়, তখন সেই জ্ঞানই বস্তুপ্রদর্শক ও প্রাপক বলতে হয়। বৌদ্ধ মতে তাই ধারাবাহিক জ্ঞান প্রমাণ বলে স্বীকৃত নয়। কারণ সেগুলো অধিগত বিষয়কেই প্রকাশ করে বা জানায়। স্পষ্টতই বৌদ্ধ মতে প্রমাণের সম্পূর্ণ লক্ষণটি হল — "অবিসংবাদকম্ অনধিগতবিষয়ং চ জ্ঞানং প্রমাণম্" অর্থাৎ যে জ্ঞানে অর্থক্রিয়াস্থিতি থাকবে এবং সম্পূর্ণ প্রাথমিক যে বস্তু জ্ঞান বা অজ্ঞাত যে জ্ঞান তাই প্রমাণ। বৌদ্ধের

প্রমাণের লক্ষণটি থেকে তাদের অপর একটি মতবাদ নিঃসৃত হয়। তারা প্রমাণ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, নৈয়ায়িকদের ন্যায় প্রমাণসপ্লবে নয়। প্রমাণ ব্যবস্থার মূল বক্তব্য হল — কোনো একটি গ্রাহ্য বিষয় বা প্রমেয়কে গ্রহণ করার জন্য একটি প্রমাণ প্রয়োগই যথেষ্ট। কারণ প্রমাণের কাজই হল অজ্ঞাত বস্তুকে জানানো, একবার যদি কোনো বিষয় কোনো প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে যায়, সেই একই বিষয়কে অন্য প্রমাণ দ্বারা পুনরায় জানার চেষ্টা অপ্রয়োজনীয় এবং ব্যর্থ। অপরদিকে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, একই প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় জানার ক্ষেত্রে দুটি প্রমাণ প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন একই আগুনকে আমরা দূর থেকে ধূমরূপ লিঙ্গের দ্বারা অনুমান করতে পারি, আবার নিকটে গিয়ে তাকে প্রত্যক্ষও করতে পারি। এবং তারা এরূপ মত পোষণ করেন এই কারণেই যে, তাদের দর্শনে চারটি প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষকেই জ্যৈষ্ঠ প্রমাণ বলা হয়। অন্যান্য সকল প্রমাণ প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল সুতরাং প্রমাণগুলির মধ্যে তুল্য বলশালিত্ব তারা স্বীকার করেননি। ফলতঃ একই বিষয়ে দুটি প্রমাণ প্রযুক্ত হতে পারে, সেক্ষেত্রে ভিন্ন প্রমাণলব্ধ দুটি ভিন্ন জ্ঞানের মধ্যেও সেই নিশ্চয়তার তারতম্য ঘটে। কিন্তু বৌদ্ধরা দুটি প্রমাণ স্বীকার করেন প্রত্যক্ষ ও অনুমান। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে প্রমাণের বিভাগ করতে গিয়ে আচার্য ধর্মকীর্তি বলেছেন — 'দ্বিবিধং সম্যগ্ জ্ঞানম্ ।।২।।'[১৭] অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান দুপ্রকার। "প্রত্যক্ষম্ অনুমানঞ্চেতি ।।৩।।[১৮] প্রত্যক্ষ ও অনুমান হল সেই দ্বিবিধ যথার্থ জ্ঞান। ধর্মকীর্তি সূত্রে উল্লিখিত চ শব্দের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে তুল্য বা সমানবলশালিত্ব প্রতিপাদন করেছেন। কারণ বৌদ্ধদর্শনে প্রমেয় পদার্থ বা গ্রাহ্য বিষয় দ্বিবিধ যথা — স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ। গ্রাহ্য বিষয়ের সংখ্যা তাদের কাছে নির্দিষ্ট। তাই তাদের নিয়তপদার্থবাদী বলা যায়। গ্রাহ্য বিষয় দুপ্রকার হওয়ায় তাদের গ্রহণের জন্য দুটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে। এবং প্রত্যক্ষের দ্বারাই কেবল স্বলক্ষণ ও অনুমানের দ্বারাই কেবলমাত্র সামান্যলক্ষণ গৃহীত হয়। এইভাবে প্রমাণ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ কারণ প্রত্যক্ষ আর অনুমান অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুকে নিয়ত বা নির্দিষ্টভাবে দেখায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বস্তুর স্বরূপকে (স্বলক্ষণকে) প্রতিভাসিত করে অর্থক্রিয়াসমর্থ ভাবরূপেই ব্যবস্থিত বস্তুকে দেখায়। তাই প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তু নিয়তার্থপ্রদর্শক হয়। অনুমান বিকল্প জ্ঞান

[১৭] তদেব., ২৯.

[১৮] তদেব., ৩২.

হলেও, তা বৌদ্ধমতে যথার্থ জ্ঞান। কারণ, অনুমানও নিয়তার্থপ্রদর্শক হয় বা অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুকে দেখায়, তবে সেটি সাক্ষাতভাবে দেখায় না। লিঙ্গের দ্বারা দেখায় পরোক্ষভাবে। অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুটি হেতুর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। লিঙ্গটি কোনো অর্থক্রিয়াকারী বস্তুর (সাধ্যের) সাথে 'তাদাত্ম্য' বা 'তদুৎপত্তি' সম্বন্ধের দ্বারা সম্বন্ধ। অনুমান তাই লিঙ্গসম্বদ্ধ অর্থক্রিয়াকারী বস্তুকে দেখায় অধ্যবসায়ের দ্বারা, প্রত্যক্ষ বস্তুবভাবকে সাক্ষাৎভাবে জানায়। প্রমাণের দ্বারা আমরা দুটি বিষয় জানতে পারি, একটি হল গ্রাহ্য বিষয় এবং অপরটি হল অধ্যবসেয় বিষয়। প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য বিষয় স্বলক্ষণ, অধ্যবসেয় বিষয় ক্ষণসন্তান। আর অনুমানের গ্রাহ্য বিষয় হল সামান্য লক্ষণ অধ্যবসেয় বিষয় হল স্বলক্ষণ। অধ্যবসেয় কথার অর্থ হল আরোপ, অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধ্যবসেয় বিষয় হল জ্ঞান নিজে সেই বস্তুকে না জানলেও তাকে দেখেছে বলে নিশ্চয় করে — এই হল অধ্যবসেয় বিষয়ের নিহিত অর্থ।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়া অন্যান্য অযথার্থ জ্ঞান যথা — ভ্রম, সংশয়, স্বপ্ন, সবিকল্পক ইত্যাদি জ্ঞান অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর প্রদর্শক হয় না (সৎ বস্তুকে প্রদর্শন করায় না) তাই তারা অপ্রমাণ। অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর প্রদর্শক না হওয়ায় সেই জ্ঞান অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর প্রাপকও হয় না। অর্থাৎ অপ্রমাণ সৎ বস্তুর, নিয়ত বস্তুর প্রদর্শক হয় না, বরং অত্যন্ত বিপর্যস্ত বস্ত দেখায়। মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থের মধ্যে তিনটি বিষয়ের ভেদ হয় যথা — দেশ, কাল ও আকার। সেই কারণে মিথ্যা জ্ঞান কখনই পুরুষার্থসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন সাধন করতে পারে না। সম্যক জ্ঞান (অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর প্রদর্শক হচ্ছে সম্যক জ্ঞান) যেহেতু পুরুষার্থসিদ্ধি ঘটায়, তাই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হল অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর প্রদর্শনকারী সম্যক জ্ঞান। সাক্ষাৎকারী সম্যক জ্ঞান প্রত্যক্ষ। আর অনুমান বিকল্প জ্ঞান হলেও প্রমাণের মর্যাদা পায়। কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ-পৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান হলেও প্রমাণ নয়, কারণ তা অধিগত প্রথম ক্ষণের অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুটিকেই (যা পূর্বে প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত) প্রকাশ করে।

উপরিউক্ত প্রমাণের আলোচনা থেকে যে মূল বিষয়গুলি জানা গেল তা হল — প্রথমত, বৌদ্ধদর্শনে প্রমাণ ও সম্যগ্ জ্ঞান এক। সেই সম্যগ্ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম যেহেতু পুরুষের সকল কামনার বিষয়ের (বিষয় দুটি হল হেয় এবং উপাদেয়) প্রাপ্তি বা সিদ্ধি সম্ভব হবে যদি তার পূর্বে বিষয় সম্পর্কে আমাদের যথাযথ জ্ঞান থাকে। তাই সম্যক জ্ঞানের নিরূপণ

ধর্মকীর্তির অবশ্য কর্তব্য। সেই সম্যক জ্ঞানের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন অর্থক্রিয়া সমর্থ বস্তুর প্রদর্শক জ্ঞান এবং অনধিগত বিষয়ক জ্ঞানই প্রমাণ। এরূপ জ্ঞানই যথাযথভাবে বস্তুর প্রাপক হয়। অন্যান্য মিথ্যা জ্ঞান বা অযথার্থ জ্ঞানের যেহেতু উপরিউক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য নেই, ফলে তা প্রমাণ নয় অপ্রমাণ। **সারসংক্ষেপে একথাই বলা যায় যে, যে জ্ঞান অর্থক্রিয়া সমর্থ বস্তুর প্রদর্শক হয় অর্থাৎ সৎ বস্তুর প্রদর্শক হয় তাই প্রমাণ। সুতরাং প্রমাণের সঙ্গে সত্তার বা সদ্‌বস্তুর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রমাণ সত্তার প্রকাশক এবং সত্তার প্রকাশের ওপরই প্রমাণের প্রমাণযোগ্যতা নির্ভর করে থাকে।** এখন নিম্নে প্রত্যক্ষের স্বরূপ এবং প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য বিষয় সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ ঃ

প্রত্যক্ষের দ্বারা অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর প্রদর্শন সম্ভব হয় বলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য বিষয় ও অধ্যবসেয় বিষয় যথাক্রমে স্বলক্ষণ ও ক্ষণসন্তান। প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে আচার্য ধর্মকীর্তি বলেছেন — "তত্র প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্।।৪।।"[১৯] অর্থাৎ তত্র শব্দের দ্বারা পূর্বে কথিত প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সমুদায়কে সূচিত করা হয়েছে। সেই সমুদায়ের মধ্যে প্রথমেই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ হল লক্ষ্য, এবং তার লক্ষণ হল কল্পনাপোঢ়ম্ অভ্রান্তম্। এখন সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ কাকে বলে, তা জানা প্রয়োজন, নাহলে কল্পনাপোঢ়ম্ এবং অভ্রান্ত এই বিশেষণ দুটি কোনোরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে তা চিহ্নিত করা যাবে না। সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ বলতে সাক্ষাতকারী জ্ঞানকেই বোঝানো হয়েছে। এই প্রকার সাক্ষাতকারী জ্ঞানেরই দুটি বৈশিষ্ট্য থাকে - যথা — কল্পনা শূন্যতা এবং অভ্রান্ততা। প্রমাণবার্তিকের ব্যাখ্যাকার মনোরথ নন্দী বলেছেন — প্রত্যক্ষজ্ঞানে সবিকল্পকতা থাকে - একথা বলা যায় না, কারণ সাক্ষাতকরণে বা জ্ঞানে কল্পনার কোনো অবসর নেই। অর্থাৎ সাক্ষাতকারী জ্ঞান সবিকল্পক নয়। প্রথম জ্ঞান নির্বিকল্পক এবং তার পশ্চাতে পূর্বগৃহীত অর্থের অধ্যারোপ করে সবিকল্পক হয়। এছাড়াও বলা হয় ইদানীন্তং উৎপন্ন হওয়া পদার্থের বাধক প্রত্যয় উৎপন্ন হয় না বলে তা অভ্রান্তই হয়। আলম্বনীভূত অর্থ সর্বত্র ভ্রমাত্মক হয়। অর্থাৎ যার সক্ষম বাধ উৎপন্ন হয় না, এরূপ তাৎকালিক অর্থের মধ্যে অভ্রান্ততা প্রতীত হয়। পরমার্থতঃ সকল প্রত্যয় আলম্বনে ভ্রমাত্মকই হয়। এটি অনেকটাই যোগাচার মতানুরূপ।

---

[১৯] তদেব., ৪৩.

অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে ব্যাখ্যাকার মনোরথ নন্দী বলেছেন, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই যথার্থ প্রত্যক্ষ, কারণ তাতে কল্পনা বা বিকল্পের কোনো স্থান নেই। কিন্তু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পৃষ্ঠে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেগুলি কল্পনা যুক্ত হওয়ায় তা যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। এবং পারমার্থিক দিক থেকে সেইসকল জ্ঞানের আলম্বনেই ভ্রান্তি ঘটে। কারণ সেখানে বস্তুকে 'এক' সামান্য রূপে নিশ্চয় করা হয়। আসলে বস্তুর স্বলক্ষণ রূপই পরমার্থসৎ, যা কেবল নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেই ধরা পড়ে।

ধর্মকীর্তি তাঁর ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে বলেছেন যে জ্ঞান কল্পনাস্বভাবশূন্য এবং অভ্রান্ত অর্থাৎ অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর রূপকে অবিপরীতভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। এখন কল্পনা এবং অভ্রান্ত শব্দ দুটির অর্থ বৌদ্ধদর্শনে কীরূপ তা না ব্যক্ত করলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে আমরা ব্যর্থ হবো।

কল্পনার স্বরূপ নিরূপণ ঃ

কল্পনার লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য ধর্মকীর্তি বলেন — "অভিলাভসংসর্গযোগ্য প্রতিভাসা প্রতীতিঃ কল্পনা" ।।৫।।[২০] অর্থাৎ কল্পনা হল এমন জ্ঞান যে জ্ঞানে বাচক শব্দ এবং বাচ্য বিষয়ের আকার মিলিত হয়, সেই মিলিত হওয়া দুরকম হতে পারে, প্রকৃতই বাচক শব্দ এবং বাচ্য বিষয় মিলিত হতে পারে অথবা মিলিত হওয়ার যোগ্যতা যদি থাকে - এই উভয় বিকল্প, যেখানে সম্ভব, সেরূপ জ্ঞান কল্পনা। এরূপ জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞানও বলা হয়।

প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থে ধর্মকীর্তি এইরূপে কল্পনাকে নিরূপণ করেন — অভিলাপিনী প্রতীতিঃ কল্পনা, অর্থাৎ যে প্রতীতি বা জ্ঞানকে অভিধা দিয়ে অভিহিত করা যায় তাই কল্পনা। সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক ভেদে জ্ঞান দুপ্রকার। নির্বিকল্পক জ্ঞান সাক্ষাতকারী জ্ঞান, এই জ্ঞানে বস্তুর নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদির প্রতিভাস হয় না। কেবল পরমার্থসৎরূপ বস্তুর তা জানায়, সেটি বস্তুর স্ফূট যে রূপ স্বলক্ষণ তাকেই জানায়। পরবর্তীক্ষণে জ্ঞানেতে বস্তুর এমন অবস্থা আসছে যাকে শব্দ দিয়ে অভিহিত করা সম্ভব হচ্ছে, তখন বিকল্প জ্ঞানে আর বস্তুর স্বলক্ষণরূপকে জানা যাচ্ছে না।

---

[২০] তদেব., ৫৭.

প্রত্যক্ষ লক্ষণে ব্যবহৃত অভ্রান্ত শব্দের অর্থ নিরূপণ ঃ

আচার্য ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে বলেছেন — "তয়া রহিতং তিমিরাশুভ্রমণনৌযান সংক্ষোভাদ্য নাহিতবিভ্রমং প্রত্যক্ষম্ ।।৬।।[২১] যে জ্ঞান কল্পনার স্বভাব থেকে মুক্ত এবং যে জ্ঞানে তিমির জাতীয় ব্যাধি, দ্রুত ঘূর্ণন, নৌকায় গমন তথা (বাত প্রভৃতির) প্রকোপ এবং অন্যান্য কারণ থেকে উৎপন্ন ভ্রান্তি থাকে না, তাকে প্রত্যক্ষ বলে। ধর্মোত্তর অভ্রান্ত শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন — "অর্থক্রিয়াক্ষমে বস্তুরূপেহবিপর্যস্তম্।" অর্থাৎ যে জ্ঞান বস্তুর প্রকৃত যে স্বভাব বা রূপ অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপ জ্ঞানে প্রতিভাসিত হবে, তাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যাবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূল নিষ্কর্ষ হল যে জ্ঞানে নির্বিকল্পকতা (কল্পনা পোয়ত্ব) ও অভ্রান্ততা এই দুটি বৈশিষ্ট্য থাকবে তাকেই প্রত্যক্ষ বলা যাবে। প্রত্যক্ষের গ্রাহ্যরূপে যে বস্তুর সাক্ষাত ঘটে সেটি অর্থক্রিয়াসমর্থ স্ফুট বস্তু। অনুমান কল্পনাযুক্ত জ্ঞান হওয়ায় কখনই বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপকে সাক্ষাতভাবে প্রতিভাসিত করতে পারে না। সেখানে অর্থক্রিয়ারূপে অধ্যবসায় করা হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষের লক্ষণ থেকে একথা স্পষ্ট যে, বৌদ্ধ মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই যথার্থ প্রত্যক্ষ। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের দ্বারাই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বা পরমার্থসৎ বস্তু স্বলক্ষণ গৃহীত হয়, কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষে বস্তুর যে সামান্যরূপ তা গৃহীত হয়। এবং সেক্ষেত্রে অধ্যবসায় বা আরোপ দেখা যায়। যেটি প্রকৃত যা নয় তাকে সেই বলে নিশ্চিত করা হয়। নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি বস্তুটিতে প্রকৃতপক্ষে থাকে না। কিন্তু বিকল্প জ্ঞানে সেগুলিই বস্তুতে আরোপ করে বস্তুকে পূর্বক্ষণের সাক্ষাতকৃত বস্তুর সঙ্গে এক বা সমান এইরূপে নিশ্চিত করা হয়। তাই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান যথার্থ প্রত্যক্ষ নয়।প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা স্বলক্ষণ বস্তুকে জানতে পারি। এখন স্বলক্ষণ বস্তুটির লক্ষণ সম্পর্কে ধর্মকীর্তি কি বলেছেন সেটি জানা প্রয়োজন। এই স্বলক্ষণ বস্তুকেই ধর্মকীর্তি পরমার্থসৎ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ স্বলক্ষণ ছাড়া সামান্যলক্ষণে প্রকৃত বস্তুকে আমরা জানি না, আমরা অনর্থকে অর্থরূপে অধ্যবসায় করে প্রবৃত্ত হয় এবং বস্তু প্রাপ্ত হই। তাই স্বলক্ষণ ও সামান্য লক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলা দরকার।

প্রত্যক্ষের গ্রাহ্য বিষয় 'স্বলক্ষণের' লক্ষণ ঃ

প্রত্যক্ষের বিষয় আরও স্পষ্টভাবে বললে গ্রাহ্য বিষয় হল স্বলক্ষণ। স্বলক্ষণ কাকে বলে, তার উত্তরে আচার্য ধর্মকীর্তি বলেন — "যস্যার্থস্য সন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাং জ্ঞান প্রতিভাসভেদস্তৎ

[২১] তদেব., ৭২.

স্বলক্ষণম্ ।।১৩।।[২২] অর্থাৎ যে অর্থের বা বিষয়ের সন্নিধান (নিকটে) বা অসন্নিধান (দূরে) হেতু জ্ঞানের প্রতিভাসের মধ্যে (গ্রাহ্য আকারের) ভেদ (স্পষ্ট ও অস্পষ্ট) হয় তাকেই স্বলক্ষণ বলা হয়। স্বলক্ষণ বস্তুর অবস্থানের তারতম্যে জ্ঞানের প্রতিভাসের মধ্যেও স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা দেখা যায়। বস্তুটি যখন কাছে অবস্থান করে তখন জ্ঞানে তার স্পষ্ট বা স্ফুটাকার দেখা যায় আবার যখন দূরে অবস্থান করে তখন অস্পষ্ট জ্ঞানাকার তৈরি করে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, স্বলক্ষণ বস্তুর অবস্থার তারতম্যের জন্য স্ফুটতার তারতম্য হয় কিন্তু কোনো ধরণের অস্ফুটতা (যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই হয় না) তার মধ্যে নেই, কারণ যতই কম পরিমাণ স্ফুটতাই উৎপন্ন করুক না কেন তবুও তা একেবারে অস্ফুট তেমন (কোনো আকারই উৎপন্ন করতে পারে না জ্ঞানে) নয়। স্বলক্ষণ বস্তুর স্ফুটতার তারতম্য হলেও অর্থক্রিয়াকারিত্বের কোনো তারতম্য হয় না। **এই স্বলক্ষণের স্বভাবই হল অর্থক্রিয়াসামর্থ্যবান হওয়া।** যেমন আগুনের স্বলক্ষণ হল — আগুনের যে ক্ষণিক রূপ পাকাদিতে সমর্থ ঐ রূপই স্বলক্ষণই। এবং পাকাদি, দাহ ইত্যাদি আগুনের অর্থক্রিয়া। বস্তু দূরে থাকুক বা নিকটে তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযোগ হওয়া মাত্রই যে প্রথম ক্ষণের জ্ঞান হয়, ঐ ক্ষণটিই স্বলক্ষণ বস্তু, প্রত্যক্ষের বিষয় ঐ স্বলক্ষণ (যার স্বরূপ অর্থক্রিয়াকারিত্ব বা অর্থক্রিয়াসামর্থ্য) যা ক্ষণিক।

বস্তুর দুটি রূপের কথা দিঙনাগ বলেন, একটি হল তার বিশেষ রূপ বা অসাধারণ রূপ, যা বস্তুটিকে বিজাতীয় সকল পদার্থ ও সজাতীয় সকল পদার্থ থেকে ব্যবৃত্ত করে। যাকে স্বলক্ষণ বলা হয়। যা উপরে ব্যাখ্যা করা হল। আরেকটি হল সামান্যলক্ষণ। যাকে বস্তুর সাধারণ রূপ বলা যায়। যেমন আমরা ব্যবহারিক জীবনে ঘট, কলসি ইত্যাদি নাম ব্যবহার করি, এইসকল জ্ঞানে বস্তুর রূপের সঙ্গে বস্তুর নামের আকারও যুক্ত হয়ে বস্তুরূপগুলি প্রতিভাসিত হয়। জ্ঞানে প্রতিভাসিত ঐ রূপগুলি ঘট বা পটের সাধারণ রূপ, কল্পিত রূপ। সব ঘটের, সব পটের সাধারণ রূপ, বিশেষ কোনো ঘট বা পটের বিশেষ রূপ নয়। বস্তুর অসাধারণরূপ বা স্বলক্ষণ হল তার অর্থক্রিয়াকারী রূপ। সাধারণ তত্ত্ব হল বস্তুর কল্পিত বা আরোপিত রূপ। অনুমানের যে বিষয়ের প্রতিভাস হয় তা অনর্থ অর্থাৎ অর্থক্রিয়াকারী বস্তু নয়। বিষয়ের যে সামান্যরূপ বা কল্পিত রূপ, যার প্রকৃত পক্ষে কোনো সত্তা নেই তাকে প্রতিভাসিত করে অনুমান। অনুমান ছাড়াও অন্যান্য বিকল্প জ্ঞানগুলিও সামান্য রূপকেই প্রতিভাসিত করে। কিন্তু সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কোনো সত্তা নেই। এই প্রসঙ্গে আচার্য

[২২] তদেব., ১১১.

ধর্মকীর্তি প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থে বলেছেন — "সঞ্চিত সমুদায়ঃ স সামান্যং তত্র চাক্ষধী। সামান্যবুদ্ধিশ্চাবশ্যং বিকল্পেনানুবধ্যতে"।।

বার্তিককার মনোরথ নন্দী সঞ্চিত সমুদায়স্য ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন — প্রত্যক্ষ অনেক অর্থ থেকে উৎপন্ন হলেও তা সামান্যবিষয়ক হতে পারে না। কেননা বস্তুস্থিতি হল — নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সামান্যবিষয়ক হয় না। সামান্যের কল্পনা নির্বিকল্পকের বিরোধী হয়। অনেক একত্র সমবস্থিত পদার্থের গ্রহণমাত্র থেকে সমুদায়ের সিদ্ধি হয় না। যদি সমুদায় কোনো অতিরিক্ত পদার্থ হয়, তাহলে হয় তা পারমার্থিক হবে অথবা বিকল্প বা কল্পিত হবে। সমুদায় কোনো পারমার্থিক পদার্থ হতে পারে না কারণ সমুদায় পদার্থ থেকে ভিন্ন সমুদায় পদার্থের পৃথক সত্তা সিদ্ধ নয়। কোনো বস্তুর প্রতিভাস হওয়া মানেই সেই প্রতিভাসিত বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। যেমন — স্বপ্নতে পরস্পর বস্তুর অপেক্ষা সামান্য অথবা সমুদায় শব্দের ব্যবহার মাত্রই হয়, সমুদায় পৃথক সিদ্ধ হয় না। তন্তুরূপকে আশ্রয় করেই পটরূপের প্রতীতি হয়, কিন্তু তার থেকে ভিন্ন কোনো দ্রব্য সিদ্ধ হয় না, কেবল অধ্যারোপ মাত্র হয়। অর্থাৎ এগুলি কেবল কল্পনামাত্র, বস্তু নয়। সমুদায়রূপতার ভান অধ্যাসের মাধ্যমে হয়ে যায়। অতএব সামান্য প্রতীতি সবিকল্পকমাত্র হয়, দ্রব্যাদিবিকল্পের ন্যায়।

অতএব অনুমানে ধূম দেখে অগ্নির যে জ্ঞান হয় সেখানে অগ্নির উপস্থিতি ব্যতিরেকেই অগ্নির জ্ঞানে কখনও সৎ বস্তু হতে পারে না। সেই অগ্নি কল্পিত, আরোপিত, অনুমানের গ্রাহ্য বস্তু বলতে সেই কল্পিত, বস্তুকে বোঝায়। আরোপিত অর্থ অনুমানের দ্বারা গৃহীত হয়ে স্বলক্ষণরূপে অধ্যবসিত হয়। এই স্বলক্ষণরূপে অধ্যবসায় হয় বলেই অনুমান প্রবৃত্তির বিষয়ের প্রাপক হয়। তাই অনুমান প্রমাণ। বার্তিককার বলেছেন - লোকপ্রসিদ্ধির ওপর নির্ভর করে প্রত্যক্ষতে স্বলক্ষণবিষয়কত্বই স্থির। আয়তনস্বলক্ষণবিষয়কে নিয়ে স্বলক্ষণ বলা হয়েছে, দ্রব্য স্বলক্ষণকে নয়।

বৌদ্ধদর্শনে এই স্বলক্ষণ বস্তুই পরমার্থ সৎ। সৌত্রান্তিক দর্শনে দুটি সত্তা স্বীকার করা হয় একটি হল সংবৃত্তি সত্তা বা ব্যবহারিক সত্তা এবং অপরটি হল পারমার্থিক সত্তা।

স্বলক্ষণ বস্তুই হল পরমার্থ সৎ। পরমার্থ শব্দের অর্থ হল অনারোপিত, অকৃত্রিম বস্তুরূপ। সেই রূপ যার আছে সে হল স্বলক্ষণ। কারণ স্বলক্ষণেরই এরূপ রূপ আছে, সে স্ব মানে নিজের,

লক্ষণ বা রূপবিশিষ্ট। এই স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষের বিষয়, অনুমানের নয়। অনুমানে অধ্যবসিত অগ্নি পরমার্থসৎ নয়, তা ব্যবহারিক সৎ। আরোপের সামর্থ্যে অবস্তু কখনও বস্তুরূপে পর্যবসিত হতে পারে না। তাহলে মরীচিকা ইত্যাদিও বস্তু বলে গণ্য হয়ে যেত। তাই বস্তু সর্বদাই অনুপচরিতস্বরূপ।

অর্থক্রিয়াকারিত্ব নিরূপণ ঃ

এখন স্বলক্ষণ বস্তুর স্বরূপ কি, তার বর্ণনা করতে গিয়ে ধর্মকীর্তি বলেছেন — স্বলক্ষণ বস্তুর স্বরূপ হল অর্থক্রিয়াতে সামর্থ্য, তাই তা সৎ। কারণ সদ্‌বস্তুর স্বরূপ হল অর্থক্রিয়াকারিত্ব বিশিষ্ট হওয়া। ধর্মকীর্তি বলেন — "অর্থক্রিয়াসামর্থ্যলক্ষণত্বাদ্‌ বস্তুনঃ ।।১৫।।[২৩] অর্থাৎ সত্তার লক্ষণ হল অর্থক্রিয়া সামর্থ্য বা অর্থক্রিয়াকারিত্ব। অর্থক্রিয়াকারিত্ব শব্দের অর্থ হল — কোনো কিছু উৎপাদন করার ক্ষমতা। তাকেই অর্থক্রিয়াকারিত্ব বলবো যার আমার কোনো প্রয়োজন সাধন করার ক্ষমতা আছে। সৎ হল যার অস্তিত্ব আছে। যা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে তাই সৎ। যে কোনো কার্যোৎপাদন করার ক্ষমতাই হল অর্থক্রিয়া। যেমন - বীজের কার্য হল অঙ্কুরোদগম্‌ করা। যখন সে কার্যোৎপাদন করে তখনই তাকে সৎ বলবো। বৌদ্ধ দার্শনিকদের যুক্তি হল সে অর্থক্রিয়াকারিত্বই হল সত্তার লক্ষণ। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে তখনই সৎ বলবো যখন সেই বস্তুটির কোনো কার্যোৎপাদন ক্ষমতা থাকবে। এক্ষেত্রে ধর্মকীর্তির যুক্তিটি হল — যদি বস্তুর কোনো একটি কার্যোৎপাদন ক্ষমতা থাকে তাহলে সে সেই ক্ষণেই কার্যটি উৎপাদন করবে। কার্যোৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে অথচ সে কার্যোৎপাদন করছে না বা মন্থরগতিতে উৎপন্ন করছে এরকম চিন্তা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। বস্তুর যদি কোনো ক্ষমতা থাকে তাহলে সেই ক্ষমতা সেই ক্ষণেই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে, এবং যেহেতু যে ক্ষণে বস্তু কার্যোৎপাদন করে সেই ক্ষণেই সৎ, অন্যসময়ে নয়। তাই বলতে হবে যে বস্তু হল ক্ষণিক। এখানে তারা সর্বাস্তিবাদীদের ত্রিকালাস্তিত্বের মতের বিরোধিতা করেন। বর্তমান সময়েই যেহেতু কার্যোৎপাদন হয় তাই বর্তমান ক্ষণটিই সৎ। অতীত ও ভবিষ্যত ক্ষণের বস্তুর যে কার্যোৎপাদন ক্ষমতা নেই, তাই তারা সৎ নয়।

অর্থক্রিয়াকারিত্ব বলতে ন্যায়বিন্দুর টীকাকার ধর্মোত্তর বলেছেন — উপাদেয় আর হেয় হল অর্থ। কিন্তু পরবর্তীকালে আচার্য রত্নকীর্তি যেকোনো বস্তুর ক্রিয়া বা কার্যোৎপত্তির ক্ষমতা বুঝেছেন

---

[২৩] তদেব., ১১৫.

এবং এই অর্থেই অর্থক্রিয়াকারিত্বকে সত্তার লক্ষণ বলেছেন। যা কিছু ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজন নিষ্পত্তি ঘটাতে সক্ষম তাই অর্থক্রিয়াবিশিষ্ট বা সৎ। যেমন — তৃষ্ণা নিবারণ করার সামর্থ্য আছে বলেই জল সৎ। সেই বিশেষ প্রয়োজন সাধন করার সামর্থ্যটাই বস্তুর আসল ধর্ম। যে ধর্মের দ্বারা প্রত্যেকটি ধর্মী বা বস্তু পৃথকরূপে সূচিত হয়। যা কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধন করতে অসমর্থ, তার অস্তিত্ব বা সত্তা কখনও মানুষ উপলব্ধি করে না। যা কোনো প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ তাই সৎ। এবং যা প্রয়োজন সাধনে অক্ষম তাই অসৎ। স্বলক্ষণ বস্তুই অর্থক্রিয়াযুক্ত এবং সেই কারণে তা প্রয়োজন নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে।

প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থের বার্তিককার মনোরথনন্দী বলেছেন — প্রতিভাসিত হলেই কোনো বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয় না। কারণ অর্থক্রিয়াকারী না হওয়ার জন্যই প্রতিভাসমান পদার্থ অসৎ রূপে কথিত হয়। কারণ সত্ত্বের লক্ষণ হল অর্থক্রিয়াকারিত্ব। গুঞ্জাপুজ্যারোপিত অগ্নিদাহ পাকাদির জনক না হওয়ার জন্যই তা সৎ নয়। ফলতঃ প্রতিভাসমান হলেই বিষয়ের সত্তা স্বীকৃত হয় না। তিমির রূপ চক্ষুরোগের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিও চোখের সামনে কেশগ্রন্থি ভাসিত হতে দেখে, কিন্তু সেই কেশ গ্রন্থির অসত্ত্বা সর্বমতসিদ্ধ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রতিভাসমান বস্তু থেকে অর্থক্রিয়া ভিন্ন অথবা অভিন্ন? যদি প্রতিভাসমান পদার্থ থেকে অর্থক্রিয়া ভিন্ন হয়, তাহলে বলতে হবে যে, অর্থক্রিয়ার কি প্রতিভাস হয় অথবা হয় না? যদি হয়, তাহলে প্রতিভাসমান পদার্থ থেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থক্রিয়া মানতে হয় বলে অনবস্থা দোষ হয়। এখন যদি তা অপ্রতিভাসমান হয়, তাহলে তার প্রতিপত্তি বা প্রতীতি হবে কী প্রকারে?

যদি প্রতিভাসমান পদার্থকেই অর্থক্রিয়া হিসাবে স্বীকার করা হয়। তাহলে অনেক প্রতিভাসমান পদার্থ যেমন মরুমরীচিকা ইত্যাদি পদার্থ যা প্রকৃতপক্ষে অসৎ, ভ্রম, তাকেই সৎ বলে স্বীকার করতে হবে, যা কখনই সম্ভব নয়।

এইসকল আপত্তির উত্তরে বার্তিককার বলেছেন — অর্থক্রিয়া, প্রতিভাসমান পদার্থ থেকে যেমন ভিন্ন তেমনি অপ্রতিভাসমান পদার্থ থেকেও ভিন্ন। অর্থক্রিয়া হল পদার্থের নিজ স্বভাব, যা প্রতিভাস-অপ্রতিভাস থেকে ভিন্নস্বরূপ। নিয়ম আছে কোনো কিছু ভিন্ন যা তা অভিন্ন হয় না, অর্থাৎ

সব অর্থক্রিয়া প্রতিভাসমান হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। যে অর্থক্রিয়াত্বেনরূপে প্রতিভাসিত হয়, তাকেই অর্থক্রিয়া বলা হয়। প্রতিভাসিত হয় যে অর্থক্রিয়া তা প্রতিভাস থেকে ভিন্ন। নীলাদ্রিরূপ থেকে ভিন্ন কোনো অর্থক্রিয়া পৃথক অবভাসিত হয় না। যে ব্যক্তির কাছে যা ইষ্টরূপে গৃহীত বা গণ্য হয় সেটাই তার কাছে অর্থক্রিয়া। ইষ্ট বা প্রয়োজনই হল অর্থক্রিয়া। কোনো ব্যক্তির কাছে কোন্ পদার্থ ইষ্ট হবে এটা ব্যবস্থিত বা নির্দিষ্ট নয়। পীড়ানিবর্তক সুখ অর্থক্রিয়া কেন নয়? কারণ পীড়া এবং সুখ এটাও ব্যবস্থিত নয়। নিজ নিজ ভাবনা অনুযায়ী এক একজন ব্যক্তির কাছে এক একটি বিষয় সৎ এবং অসৎ রূপে সুখ এবং দুঃখ রূপে নির্ধারিত হয়। ভাবনার ভাবের দ্বারা সত্ত্ব এবং অভাবের দ্বারা অসত্ত্বের পারমার্থিক ব্যবস্থা হয়। তাহলে ভাবনার ওপর নির্ভর করে জ্ঞানকেও সেরূপ মানতে হবে অর্থাৎ প্রতিভাসমান বস্তু জ্ঞানরূপ হয়, অসৎ নয়। অবিদ্যার ওপর আশ্রয় করে উৎপন্ন যা তাই অসৎ। কারণ আবিদ্যক পদার্থের কোনো সত্ত্বা নেই। কেবল প্রতিভাসমান অবিচারিত রমনীয় সমৃদ্ধ বস্তুই সৎ-ই হয়।

অর্থক্রিয়াকারিত্বের দ্বারা ক্ষণিকত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ঃ

জগতের প্রতিটি বস্তুর অনিত্যতা বা ক্ষণস্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য বৌদ্ধদার্শনিকরা সাধারণতঃ দু'ধরণের যুক্তি দিয়ে থাকেন। একটি তার ব্যবহারিক সত্তার দিক থেকে এবং অপরটি বস্তুর বিনশ্বর স্বভাবের দিক থেকে।

ব্যবহারিক সত্তার দিকটি আমরা ইতিপূর্বে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি প্রত্যেকটি প্রয়োজন সাধন করাকেই বস্তুর অর্থক্রিয়া বলা হয়। ফলতঃ বস্তুটি না থাকলে সেই অসাধারণ কার্যটি সম্পাদন হয় না, তাই বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধন বা অর্থক্রিয়াসম্পাদনের প্রতি বিশেষ বিশেষ বস্তুটিকে অবশ্যই কারণ বলতে হয় এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক বস্তু নিজের কার্যটি কোনো একটি ক্ষণেই সম্পাদন করে, ওই কার্যটি সম্পাদনের জন্য একাধিক ক্ষণের প্রয়োজন নেই। জলের বিশেষ কার্য হল তৃষ্ণা নিবারণ ঘটানো, ফলতঃ পিপাসার্ত ব্যক্তি যে ক্ষণে জল পান করে সেইক্ষণেই তৃষ্ণানিবৃত্তিরূপ কার্যটি ঘটবে, তার জন্য একের অধিক ক্ষণ প্রয়োজন নেই। সুতরাং বস্তু যে ক্ষণে নিজের কার্য সম্পন্ন করছে, তার পূর্বক্ষণে বা পরক্ষণে সেই একই বস্তু বিদ্যমান থাকে কিনা তা একটি বিচার্য বিষয়। যদি দেখা যায় অনন্য সাধারণ কার্য উৎপাদন করার

আগে বা পরেও বস্তুটি বর্তমান থাকছে, তাহলে বস্তুটিকে স্থায়ী বলে গণ্য করতে হবে। অপরদিকে যদি কেবলমাত্র কার্যোৎপাদন ক্ষণেই বস্তুটি থাকে তার আগে বা পরে না থাকে, তাহলে বস্তুটিকে ক্ষণিক বলতে হবে।

এখন বস্তুর কার্যোৎপত্তি প্রণালী আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন যে, স্থির বস্তুর ক্রমিক অথবা যুগপৎ কার্যোৎপত্তি প্রণালী আদৌ সম্ভব কিনা? যদি দেখা যায় দুটির কোনোভাবেই কার্যোৎপত্তিপ্রণালী সম্ভব নয়, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, স্থির বস্তু কার্যোৎপাদক হয় না।

প্রথমে দেখা যাক স্থির বস্তুর ক্রমিক কার্যোৎপত্তি সম্ভব কিনা। কার্যোৎপত্তির পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি কার্যের একটি অসাধারণ কারণ থাকে। যে কারণ নিজের সামর্থ্য বা শক্তিতে কার্যোৎপাদন করতে সমর্থ তাকেই অসাধারণ কারণ বলে। যেমন দাহের প্রতি বহ্নি অসাধারণ কারণ, কেননা বহ্নি নিজস্ব শক্তির দ্বারাই দহনরূপ কার্য সম্পন্ন করতে পারে। প্রত্যেকটি অর্থক্রিয়া সম্পাদনের অসাধারণ কারণই ওই অর্থক্রিয়া সম্পাদক পরমার্থ বস্তুটি হবে। অসাধারণ কারণ উপস্থিত হলে কার্যোৎপত্তিতে বিলম্ব হয় না, তৎক্ষণাৎ ঘটে। এখন অর্থক্রিয়াসম্পাদক বস্তুটি আছে অথচ কার্যোৎপত্তি ঘটছে না একথা বলা যায় না। তাহলে বলতে হবে অসাধারণ কারণ উপস্থিত হয়েও কার্যোৎপাদন হচ্ছে না। অর্থক্রিয়াসম্পাদক বস্তু যদি স্থির হয় তাহলে ঐ বস্তুর ক্রমিক অর্থক্রিয়া নিষ্পত্তি কোনো ক্রমেই সম্ভব হবে না। যা প্রতিটি ক্ষণেই অর্থক্রিয়া সম্পাদন করছে তাকেই ক্রমিক অর্থক্রিয়া সম্পাদক বলা যেতে পারে। এখন কোনো বস্তুর বর্তমান ক্ষণে যে অর্থক্রিয়া সম্পাদন হবে, অতীত ও ভবিষ্যত ক্ষণে সেই একই অর্থক্রিয়া সম্পাদিত হবে না — এটাই ক্রমিক অর্থক্রিয়া সম্পাদনের স্বরূপ। কিন্তু অর্থক্রিয়াসম্পাদক বস্তুটি যদি স্থির হয় তাহলে তা বর্তমান ক্ষণে যেমন অর্থক্রিয়াসম্পাদনের অসাধারণ কারণ হবে, অতীত ও ভবিষ্যত ক্ষণেও তাই হবে। এই অবস্থায় একই বস্তুকে ক্রমিক যাবতীয় অর্থক্রিয়া সম্পাদনের অসাধারণ কারণ হিসাবে স্বীকার করলে, যাবতীয় অর্থক্রিয়া যে কোনো ক্ষণেই সম্পাদিত হোক - কিন্তু একথা বলা যায় না। এক, স্থির বস্তু অতীত, বর্তমান ভবিষ্যত যাবতীয় কালে সম্পাদনযোগ্য অর্থক্রিয়া সম্পাদনের অসাধারণ কারণ হলে বর্তমান কালেও অতীত ও ভবিষ্যতকালের অর্থক্রিয়া উৎপন্ন হতে পারে এবং অতীত ও অনাগত কালেও বর্তমান কালের অর্থক্রিয়া সম্পাদিত হতে কোনো বাধা থাকতে পারে না। অথচ এরকম কল্পনা একপ্রকার অসম্ভব কল্পনা। একই ক্ষণে যাবতীয় ক্ষণের অর্থক্রিয়া

সম্পাদন স্বীকার করতে হবে যা অসম্ভব। অর্থক্রিয়াসম্পাদক বস্তু স্থির হলে তার যুক্তিসিদ্ধ ক্রমিক অর্থক্রিয়া সম্পাদন অসম্ভব।

কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন যে, কোনো বস্তু তার অর্থক্রিয়া সম্পাদন করতে কেবল তার অসাধারণ কারণেরও ওপর নির্ভর করে না কিছু সহকারী কারণও প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকটি ক্ষণে ক্রমিক অর্থক্রিয়া সম্পাদনের জন্য তাকে সহকারী কারণের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং বর্তমান ক্ষণে যে অর্থক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তার সহকারী কারণ বর্তমান ক্ষণ, একইভাবে অন্যান্য ক্ষণগুলি অন্যান্যকালের বস্তুর সহকারী কারণ। বর্তমান ক্ষণে যেহেতু অতীত বা অনাগত রূপে সহকারীরূপ কারণ থাকে না ফলে স্থির বস্তুর পক্ষেও বর্তমান ক্ষণে অতীত ও অনাগতকালীন বস্তুর অর্থক্রিয়া সম্পাদন সম্ভব নয়। ফলতঃ এইভাবে স্থির বস্তুর ক্রমিক অর্থক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়।

বৌদ্ধরা এর উত্তরে বলেন, কোনো বস্তু নিজস্ব অসাধারণ শক্তিতে যে অর্থক্রিয়া নিষ্পাদন করে সেই অর্থক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য অপর কোনো সহকারী কারণের অপেক্ষা আছে একথা বলা যায় না। কারণ, সহকারী কারণ নির্ধারণ করা কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার, যদি সহকারী কারণ মূল কারণের কোনো উপকারই সাধন করতে না পারে তাহলে তাকে সহকারী কারণ বলাও যায় না। আবার যদি মূল কারণের উপকার সাধন করে বলেই কার্যোৎপত্তি সম্ভব হয়, তাহলে তাকে আর কার্যোৎপত্তির প্রতি সহকারী কারণ বলা যায় না, তা মূল কারণেই পর্যবসিত হয়, যেহেতু একমাত্র মূল কারণই নিজের স্বভাবে বা শক্তিতে কার্যোৎপত্তিতে সক্ষম। ফলতঃ সহকারী কারণকেই মূল কারণ রূপে স্বীকার করতে হয় যা স্বীকার করা যায় না। ফলতঃ সহকারী কারণ কল্পনা করা সম্ভব নয়।

এখন ধর্মকীর্তি দ্বিতীয় কার্যোৎপত্তি প্রণালীকে কার্য যুগপৎ উৎপন্ন হয় — এটি বিশ্লেষণ করে দেখাবেন যে, স্থির বস্তু যুগপৎ কার্যোৎপাদন করতেও সমর্থ নয়। ধরা যাক, একটি বীজ যদি যুগপৎ অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তার কার্য উৎপাদন করে অর্থাৎ 'ক' ক্ষণে যদি বীজটি তার সম্পূর্ণ কার্যটি উৎপন্ন করে তাহলে 'খ' ক্ষণে সেই একই বীজ কী কার্যোৎপাদন করবে? বীজটি 'ক' ক্ষণে যে কার্যোৎপাদন করেছে সেই একই কার্যোৎপাদন 'খ' ক্ষণে করবে না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক্ - পূর্বেই যে প্রাণীটি নিহত হয়েছে, তাকে পুনরায় আর নতুন করে কেউ নিহত

করতে পারে না। এমতাবস্থায় যদি 'ক' ও 'খ' ক্ষণের বীজকে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য করা হয় তাহলে একই বস্তুতে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্‌গমের কারণ এবং অঙ্কুরোদ্‌গমের কারণ নয় — স্বীকার করতে হবে, যা যৌক্তিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ। এই প্রকার যৌক্তিক অসঙ্গতি এড়াতে স্বীকার করতে হবে যে 'ক' ক্ষণের বীজ ও 'খ' ক্ষণের বীজের মধ্যে পার্থক্য আছে, অর্থাৎ তারা দুটি ভিন্ন বীজ। ফলতঃ বস্তুর যুগপৎ কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করতে হলে বস্তু যে ক্ষণিক তা অনিবার্যভাবে স্বীকৃত হয়। না হলে, উপরিউক্ত আপত্তি দেখা যায়।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ধর্মকীর্তি দুপ্রকার কার্যোৎপত্তি প্রণালী বিশ্লেষণ করে প্রদর্শন করলে যে স্থিরবস্তু কোনোপ্রকার কার্যোৎপত্তি প্রণালীরই অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। যদি স্থিরবস্তুকে কার্যোৎপত্তি প্রণালীর অন্তর্ভূক্ত রূপে স্বীকার করা হয় তাহলে যে সকল হাস্যস্পদ এবং অযৌক্তিক ফলাফল নিঃসৃত হচ্ছিল, সেইসকল হাস্যস্পদ এবং অযৌক্তিক ফলাফল স্বীকার করে নিতে হবে, সিদ্ধান্তরূপে যা কোনো দার্শনিকই নিজের দর্শনের সিদ্ধান্তরূপে কামনা করবেন না।

অর্থক্রিয়াসাধক বস্তু যে ক্ষণিক তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বৌদ্ধগণ দ্বিতীয় একটি যুক্তি দিয়ে থাকে, সেই যুক্তিটি বস্তুর বিনাশশীলতা স্বভাবের দিক থেকে। সেই বস্তুর বিনশ্বরতা স্বভাবই বস্তুর ক্ষণিকত্বের মূল উৎস। বস্তু বিনষ্ট হয়, তা কি তার নিজের স্বভাবের বা নিজের জন্যই নাকি বস্তু অতিরিক্ত কোনো বাহ্য কারণের দ্বারা বস্তুর বিনাশ হয়? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ন্যায় বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম বিবাদ পরিলক্ষিত হয়। যদিও সেই বিবাদ এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা এখানে কেবলমাত্র বৌদ্ধদের যুক্তিটিই দেখবো। তাদের যুক্তিটি হল বস্তু যদি তার বিনাশের জন্য নিজ অতিরিক্ত অন্য কোনো কারণের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে উৎপত্তির পরক্ষণে বস্তুর বিনাশ সম্ভব হবে না, কারণ বিনাশের কারণ উপস্থিত হওয়ার জন্য অন্তত অতিরিক্ত একটি ক্ষণ স্বীকার করতে হবে, যে ক্ষণে বস্তু অস্তিত্বশীল হবে। ফলতঃ বিনাশের জন্য বস্তু অন্য কোনো কারণের ওপর নির্ভর করে না এটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বিনাশস্বভাব বস্তুর কারণান্তর নিরপেক্ষভাবে বিনাশ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যেহেতু ক্ষণ অপ্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় ওইরকম বিনাশ ও সূক্ষ্ম হয়ে পড়ে ফলে তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হতে পারে না অতএব তা যুক্তি বা অনুমানের দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়। আচার্য শান্ত রক্ষিত তাঁর তত্বসংগ্রহ গ্রন্থে যুক্তি প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, বস্তু বিনশ্বরস্বভাব বলেই তা নিজের বিনাশের জন্য অন্য কোনো কারণের ওপর

নির্ভর করে না। তিনি যে অনুমানটি প্রয়োগ করেছেন তা হল — "বিনাশস্বভাশীলং বস্তু হেত্বন্তর নিরপেক্ষ বিনাশী অনিত্যত্বাৎ" যথা সামগ্রী স্বকার্যে। যুক্তিটির তাৎপর্য হল বস্তু বিনাশস্বভাব, কারণ যেসমস্ত বস্তু অনিত্য তাদের বিনাশশীলতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। অর্থক্রিয়াকারিত্বের ফলেই বস্তুর বিনাশশীলতা যে স্বাভাবিক তা যুক্তিসিদ্ধ। অতএব অর্থক্রিয়া সাধক বস্তুমাত্রই বিনাশস্বভাব বলে অনিত্য। যেটা যার স্বভাব তা কখনও স্বভাব অনুযায়ী অবস্থার জন্য অন্য কোনো কারণকে অপেক্ষা করে না। প্রকৃতপক্ষে নিজের ভাবে বিদ্যমান থাকাকেই স্বভাব বলে। স্বভাব অনুসারে যা ঘটে তাকেই স্বাভাবিক বলে। যে বস্তু বিদ্যমান থাকলে তার কার্যের উৎপত্তির জন্য অন্য কোনো সহকারী কারণের অপেক্ষাবশতঃ বিন্দুমাত্র বিনাশ হয় না, তাই তার স্বাভাবিক কার্য। যেমন — জলপান করলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়, ফলে তৃষ্ণানিবারণ জলের স্বাভাবিক কার্য, আগুনে হাত দিলে হাতে পোড়ে ফলে দহন অগ্নির স্বাভাবিক কার্য। একইভাবে অর্থক্রিয়া যেরূপ স্বাভাবিক কার্য বস্তুর সেইরূপ বিনাশশীলতাও বস্তুর স্বাভাবিক কার্য। বস্তুটা উৎপন্ন হলেই তার বিনাশের জন্য কারণান্তরের অপেক্ষা থাকে না। বিনশ্বর স্বভাব, বস্তুর নাশ তার স্বাভাবিক কার্য। সুতরাং যে মুহূর্তে কার্যোৎপন্ন হয়ে যায় সেই মুহূর্তেই বস্তু বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে বস্তু ক্ষণিক।

এই প্রকারে ধর্মকীর্তি জাগতিক সকল বস্তুই যে ক্ষণিক তা প্রতিপাদন করেছেন। ধর্মকীর্তিই সম্ভাব্য প্রথম ক্ষণিকত্ববাদকে যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ যুক্তিবিদ্‌গণ যেমন শান্ত রক্ষিত, কমলশীল, জ্ঞানশ্রী এবং রত্নকীর্তি ক্ষণিকত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে নানান ধরণের যুক্তির অবতারণা করেন। 'জাগতিক সবকিছুই ক্ষণিক' একথার অর্থ হল সকল বস্তুই এক ক্ষণে অস্তিত্বশীল হয় এবং পরক্ষণেই তা অনস্তিত্বে পর্যবসিত হয়। ধর্মকীর্তির মতে, প্রকৃত অস্তিত্বশীল বা সদবস্তু মাত্রই তা অর্থক্রিয়াকারিত্ব বিশিষ্ট (বিশেষ কার্যোৎপাদন সামর্থ্য রয়েছে)। 'কোনো কিছু অস্তিত্ব আছে' বলার অর্থই হল তা কোনো কিছু কার্য উৎপাদন করছে এবং কার্যোৎপাদন সামর্থ্য থাকার অর্থই হল সে সেই ক্ষণেই কার্যোৎপাদন করবে এবং পরক্ষণে বিনষ্ট হয়ে যাবে — অতএব অর্থক্রিয়াসাধক বস্তু অবশ্যই ক্ষণিক হবে।

সিদ্ধান্ত

অদ্যাবধি আমরা ভূমিকা ও তিনটি অধ্যায় আলোচনা করেছি। সেখানে তিনটি অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, সত্তার লক্ষণ বিষয়ে, বৌদ্ধদর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য এবং অর্ন্তদ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায় বর্তমান, এবং তাদের মধ্যে তাত্ত্বিক বহু বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদের পশ্চাতে বৌদ্ধদর্শনের একটি ইতিহাস বর্তমান। সেটি আমাদের এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় নয়। সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আমার মূল করণীয় কর্তব্য হল পূর্বোক্ত মতবাদগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্তা সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিযুক্ত মতবাদ সেটিকে ব্যক্ত করা।

পূর্বোক্ত তিনটি অধ্যায়ে যথাক্রমে সর্বাস্তিবাদ, ভদন্ত রাম ও সৌত্রান্তিক আচার্য ধর্মকীর্তির সত্তার ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, ভদন্ত রামের মতামত সৌত্রান্তিক মতের অনুরূপ হওয়ায় আমরা একথা স্বীকার করে নিতে পারি যে, সত্তা সম্পর্কে তিনি সৌত্রান্তিক মতানুসারী। এই স্থলে আমি ভদন্ত রামের মতটি তাই স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করছি না। সর্বাস্তিবাদ ও আচার্য ধর্মকীর্তির মতবাদটিই এক্ষেত্রে পর্যালোচনার বিষয়। সর্বাস্তিবাদ ও আচার্য ধর্মকীর্তির সত্তার ধারণাটিকে পর্যালোচনা করার পূর্বে সাধারণভাবে বলে নেওয়া আবশ্যক যে, সর্বাস্তিবাদীরা মূলতঃ কালিকতার প্রকারভেদের মানদণ্ডরূপে কারিত্রের ধারণাটি প্রদান করেন। পরবর্তীকালে সেটিই সত্তার লক্ষণে (বর্তমানতার প্রতীক) রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। কিন্তু আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি যে কীভাবে কারিত্রের ধারণাটি বিভিন্ন সর্বাস্তিবাদীদের নিকট পরিবর্তিত হয়েছে। মূল কথা হল সর্বাস্তিবাদীগণের দর্শনের মূল বক্তব্যই হল সংস্কৃত ধর্ম তিনকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালে) অস্তিস্বশীল এবং সৎ। এমতাবস্থায় তাদের দর্শনের মূলনীতিটিকে রক্ষা করার জন্য তারা বিভিন্নভাবে সচেষ্ট হন। তিনকালে সংস্কৃত ধর্ম সৎ হলেও অতীতের ধর্ম, বর্তমানের ধর্ম ও ভবিষ্যতের ধর্মকে পরস্পরের থেকে পৃথক করার জন্য তারা কারিত্রের ধারণাটির উদ্ভাবন ঘটান। যে ধর্ম কারিত্রবিশিষ্ট তা বর্তমান ধর্ম, যে ধর্মের কারিত্র ধ্বংস হয়ে গেছে তা অতীত ধর্ম এবং যে ধর্ম এখনও কারিত্র প্রাপ্ত হয়নি, কারিত্রের অপেক্ষায় আছে তা ভবিষ্যত ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আমার সর্বাস্তিবাদীগণের মতের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলা যায় যে, তারা সৎ বস্তুকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হল কার্যোৎপাদন সামর্থ্যযুক্ত বর্তমান ধর্ম, এবং অন্যটি হল কার্যোৎপাদন সামর্থ্যহীন অতীত ও ভবিষ্যত অর্থাৎ অ-বর্তমান ধর্ম। কারিত্র বা কার্যোৎপাদনসামর্থ্য হল বর্তমানতার প্রতীক বা চিহ্ন এবং কারিত্রহীনতা বা অ-বর্তমানতা হল অতীত ও ভবিষ্যত ধর্মের প্রতীক বা চিহ্ন। অতীত ও ভবিষ্যতের ধর্ম সৎ বা অস্তিত্বশীল কিন্তু তারা বর্তমান নয় কারণ তারা কারিত্রের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নয়। স্বাভাবিকভাবেই সর্বাস্তিবাদীগণের মূল বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট যে, তারা সত্তার বা অস্তিত্বের একটি তারতম্য স্বীকার করেছেন, অতীত ও ভবিষ্যতের ধর্মগুলি বর্তমান ধর্মের ন্যায় অস্তিত্বশীল নয় বা সৎ নয়। বর্তমানের সত্তার সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যতের সত্তার তীব্রতার দিকে তারতম্য আছে। এবং বর্তমানতার চিহ্ন কারিত্রকে মানদণ্ড করেই অতীত ও ভবিষ্যত ধর্মকে বর্তমান ধর্ম থেকে পৃথক করা হচ্ছে। ফলতঃ এমতাবস্থায় কারিত্রবিশিষ্ট বর্তমান ধর্মকেই সৎ বলাটাই অধিক শ্রেয়, তা না করে যার কারিত্র নেই, যা অ-বর্তমান তার দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যত ধর্মের অস্তিত্ব বা সত্তা স্বীকার অপ্রাসঙ্গিক বা হাস্যস্পদ একটি ঘটনা। "যা কার্যোৎপাদন করছে না, বা যার কার্যোৎপাদন সামর্থ্য বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাকে সৎ কোন্ অর্থে বলা যায়? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তাদের দর্শনে পাওয়া যায়নি।

অতএব সংস্কৃত ধর্মের তিনকালে সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করেও সেই অস্তিত্বের সমমানতা স্বীকার করেননি। বর্তমান ধর্মকেই বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং যদি বর্তমান ধর্মই যদি কেবল কার্যোৎপাদনসামর্থ্যযুক্ত হয়, তাহলে কেবল তাকেই সৎ বলা শ্রেয়। এমনিতেও অতীত ও ভবিষ্যত ধর্মের অস্তিত্ব আছে - একথা সাধারণ মানুষের কাছেও বোধগম্য নয়।

সুতরাং সর্বাস্তিবাদীগণের মতবাদ যে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। নিম্নে সর্বাস্তিবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি করা হল —

প্রথমত, তিনকালে ধর্মগুলি সৎ হলে ক্ষণিকত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ তাদের মতবাদ ক্ষণিকত্ববাদের বিরোধী। যদিও সর্বাস্তিবাদে ক্ষণিকত্ববাদকেও রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু যে যুক্তিতে তারা ক্ষণিকত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছেন, সেই যুক্তিটি ভীষণই দুর্বল। তারা বলেন, ধর্মগুলি তিনকালে সৎ হলেও, ধর্মভাব পরিবর্তিত হয়। ধর্মভাব প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত

হওয়ার অর্থ হল ধর্মভাবগুলি ক্ষণিক। কিন্তু ক্ষণিকত্ববাদ রক্ষা করতে গেলে সর্বাস্তিবাদ আর রক্ষা করা যায় না কারণ ধর্মভাব পরিবর্তিত হওয়ার অর্থ হল ধর্মও পরিবর্তিত হওয়া, ধর্মভাব অতিরিক্তভাবে ধর্ম বলে কোনো কিছু আছে, যা অপরিবর্তিত হয়ে থাকে - একথা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং একই সঙ্গে সর্বাস্তিবাদ ও ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, তিনকালে বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তারা সৎ বা অস্তিত্বের মধ্যে একপ্রকার তারতম্য স্বীকার করেছেন। এবং বর্তমান ধর্মের ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুতরাং সেই অর্থে বর্তমান ধর্মকেই কেবলমাত্র সৎ বললেই তা অধিক সঙ্গত হতো। যে যুক্তিটি একটু আগেই আমরা আলোচনা করলাম।

তৃতীয়ত, প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মহাবিভাষায় ও অভিধর্মে কারিত্র ও ধর্মস্বভাবের মধ্যে একপ্রকার সম্পর্কের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে সম্পর্কের স্বরূপ কি প্রকার হবে, তা নিয়ে মতানৈক্য ছিল। কারিত্র ও ধর্মস্বভাবের মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে, তাহলে বর্তমান ধর্মের অতীত ও ভবিষ্যত অবস্থার নিঃস্বভাবতা স্বীকার অনিবার্য হয়ে পড়বে। এছাড়াও কারিত্রের সত্তা ভগবান বুদ্ধদেবও স্বীকার করেননি।

কারিত্র ও ধর্মস্বভাব ভিন্ন না হলে কারিত্রও ধর্মের ন্যায় সর্বদা বর্তমান থাকবে। ফলতঃ কারিত্রের দ্বারা যে অধ্বব্যবস্থা উপপন্ন হচ্ছিল সেটি আর সম্ভব হবে না। এছাড়াও কারিত্রের কদাচিতকত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ সংস্কৃত ধর্মগুলি তিনকালে সৎ হলেও তা সর্বদা নিজ নিজ কারিত্র করে না, কেবল বর্তমান কালেই তা করে থাকে। ফলতঃ কারিত্র ও সংস্কৃতধর্ম ভিন্ন না অভিন্ন এই দুটি বিকল্পের দুটির কোনোটিই সর্বাস্তিবাদীগণ স্বীকার করতে পারবেন না। কারিত্র ও ধর্মস্বভাব ভিন্ন হলে স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তনের অতিরিক্ত সংস্কৃত পদার্থ কারিত্রের সত্তা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বৈভাষিকগণ স্কন্ধ ও ধাতু ও আয়তনের অতিরিক্ত কোনো পদার্থ স্বীকার করেননি। ফলত, প্রথম বিকল্প মানলে স্বসিদ্ধান্তবিরোধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিকল্প স্বীকার করলে, অর্থাৎ ধর্ম ও কারিত্র অভিন্ন হলে, সংস্কৃত ধর্মের ন্যায় কারিত্র ও ত্রিকাল সৎ হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে কারিত্রের দ্বারা অধ্বব্যবস্থা উপপন্ন করা দুর্নিবার হয়ে পড়বে। সুতরাং দুটি বিকল্পের যে কোনো একটি গ্রহণ করলেই সর্বাস্তিবাদীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সর্বাস্তিবাদীদের হয় সংস্কৃত

ধর্মের ত্রিকালাস্তিত্ববাদ পরিহার করতে হয় অথবা অধ্বব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করতে হয়। দুটিকে সমানভাবে রক্ষা করা যায় না।

যদিও সর্বাস্তিবাদীরা উপরিউক্ত আপত্তির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই উত্তরটিও স্পষ্ট নয়। তারা বলেন, ধর্মস্বভাব ও কারিত্রের মধ্যে দুটি সম্পর্কই (তাদাত্ম্য ও ভেদ) তাদের সকল সম্পর্কের সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করে না, তারা একটি তৃতীয় বিকল্পের প্রস্তাব দেন। কারিত্র ও ধর্মস্বভাব একেবারে ভিন্নও নয় আবার অভিন্নও নয়। ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কারিত্র অস্তিত্বশীল নয়, কিন্তু কারিত্র ও ধর্মস্বভাব অভিন্ন এবং স্থায়ীভাবে অবস্থান করে একথাও বলা যায় না, কিন্তু সর্বাস্তিবাদীগণের প্রসক্তি যুক্তিটিও স্পষ্ট নয় এবং সেই কারণে সমালোচনার উর্দ্ধে নয়।

চতুর্থত, সংস্কৃত ধর্মগুলিকে তিনকালে সৎ রূপে স্বীকার করেও চারটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হিসাবে দেখেছেন, যা নিতান্তই অসমীচীন। সর্বাস্তিবাদীরা সংস্কৃত ধর্মের চারটি লক্ষণের বা বৈশিষ্ট্যের যথা — উৎপত্তি, ধ্বংস, ধারাবাহিকতা, অনিত্যতা স্বীকার করেও সংস্কৃত ধর্মকে তিনকালে সৎ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। যা তিনকালে সৎ তা নিত্য কারণ সদাসত্ত্ব ব্যতিরেকে নিত্যতার আর কোনো মানদণ্ড হতে পারে না। সর্বাস্তিবাদীরা সংস্কৃত ধর্মগুলিকে তিনকালে সৎ বললেও নিত্য হিসাবে গণ্য করেন না। এক্ষেত্রে আপত্তি হয় যে, সদাসত্ত্ব ব্যতিরেকে নিত্যতার মানদণ্ড কী হতে পারে, তা স্পষ্টভাবে সর্বাস্তিবাদীরা ব্যক্ত করেননি। এবং সংস্কৃত ধর্ম চারটি লক্ষণযুক্ত হয়েও কীভাবে তিনকালে সৎ হয় তার ব্যাখ্যাও সর্বাস্তিবাদীরা স্পষ্টভাবে দিতে পারেননি।

পঞ্চমত, এক্ষেত্রে আমার আপত্তিটি মূলতঃ আচার্য সঙ্ঘভদ্রের দুপ্রকার শক্তির যে বিভাগীকরণ সেই ধারণার বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, আচার্য সঙ্ঘভদ্রের মূল গ্রন্থটির যেহেতু চীনা অনুবাদ আছে, এবং সেই ভাষার প্রতি দখল না থাকার দরুণ সঙ্ঘভদ্রের বক্তব্যটি আমি অন্যান্য গৌণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করেছি। ফলতঃ আচার্য সঙ্ঘভদ্রকে যথাযথভাবে আমি বুঝতে ব্যর্থ হতে পারি। সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্যটি বা তাকে বোঝার মধ্যে ফাঁক থেকে যেতে পারে।

আচার্য সঙ্ঘভদ্র তার পূর্ববর্তী সর্বাস্তিবাদী বসুমিত্রের কারিত্রের ধারণার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে ধর্মের দু'প্রকার শক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। একটি হল সামর্থ্য এবং অন্যটি হল কারিত্র। কারিত্র হল এক বিশেষ ধরণের শক্তি, যা কখনও বাহ্য পরিবেশের এবং অবস্থার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে না। কিন্তু সামর্থ্য হল এমন শক্তি যা বাহ্য পরিবেশ ও অবস্থা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে - অন্ধকারে চক্ষুধর্মের যে রূপদর্শনের সামর্থ্য সেটি আবরণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, কিন্তু অন্ধকারেও চক্ষুর ফলাক্ষেপশক্তি রয়েছে। কারিত্র বা ফলাক্ষেপশক্তি অন্ধকারের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে, সামর্থ্যের বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে কারিত্রও কোনো না কোনো ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হল, কারিত্র বা ফলাক্ষেপ শক্তি যদি বাহ্য পরিবেশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত নাই হয়, তাহলে অন্ধকার থাকা সত্বেও "চক্ষু ফলের প্রতি অভিক্ষেপ করুক" — কিন্তু অন্ধকারে চক্ষু কীভাবে ফলের প্রতি অভিক্ষেপ করে — তা স্পষ্ট নয়। প্রতিবন্ধকতার কারণে সামর্থ্য বিঘ্নিত হলে সেই ক্ষণে কারিত্রও বিঘ্নিত হয়। সুতরাং আমার মনে হয়েছে, এইভাবে দু'ধরণের শক্তির মধ্যে যে যুক্তিতে পার্থক্য সঙ্ঘভদ্র করেছেন, সেই যুক্তিটি দৃঢ় নয়। সেক্ষেত্রে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়।

এছাড়াও সর্বাস্তিবাদে বহুক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার সেই দুটি শব্দকেই ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে সর্বাস্তিবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন — ধর্ম ও ধর্মস্বভাব কখনও একই অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় আবার সেই দুটি শব্দ কখনও ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সর্বোপরি, একথা বলা যায় যে, সর্বাস্তিবাদের মতবাদটি খুব একটা যৌক্তিকভাবে সংগঠিত মতবাদ নয় এবং বহুক্ষেত্রে তাদের মতবাদের মধ্যে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখা দেওয়ায় তাদের মতবাদটিকে অধিক যুক্তিযুক্ত বলা যায় না। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও তাদের মতবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সর্বাস্তিবাদেই প্রথম কারিত্রের (সত্তার লক্ষণ) ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালে সৌত্রান্তিকগণের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে অর্থক্রিয়াকারিত্বের রূপপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও সর্বাস্তিবাদীরা সৎ ও অসৎ বা অলীকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যা কিছুই কোনো কালে অস্তিত্বশীল ছিল তাকেই তারা সৎ বলেন, বিপরীতে আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র এরা কোনো কালেই অস্তিত্বশীল নয় বলে এরা অসৎ বা অলীক। এই ধরণের মতবাদ সত্যিই তাদের অভিনবত্ব সূচিত করে।

আমার মতে, আচার্য ধর্মকীর্তির সত্তার ধারণাটি অনেক বেশি উন্নত এবং যুক্তিযুক্ত। কারণ আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি যে, তার কাছে যা অর্থক্রিয়াকারিত্ব বিশিষ্ট তাই সৎ। এবং অর্থক্রিয়াকারিত্ব হল স্বলক্ষণ বস্তুর স্বভাব। যে স্বলক্ষণ বস্তু কেবল ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী। ফলতঃ যা কার্যোৎপাদনসামর্থ্য আছে তা কেবল ক্ষণিক, তিনকালে সৎ নয়। কোনো বস্তুর কার্যোৎপাদনসামর্থ্য থাকলে এবং প্রতিবন্ধকের অভাব থাকলে বস্তুটি সেই ক্ষণেই কার্যটি উৎপন্ন করবে এবং বস্তুর স্বভাববশতঃই কার্যোৎপাদন করেই বিনষ্ট হবে। ফলতঃ অর্থক্রিয়াসমর্থরূপ হেতুর দ্বারাই ক্ষণিকত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আমার মতে যৌক্তিকতার ভিত্তিতে ধর্মকীর্তির সত্তার লক্ষণটি প্রতিষ্ঠিত বলে দর্শনের জগতে সৌত্রান্তিক আচার্য ধর্মকীর্তির মতবাদটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Cox, Collett, *Disputed Dharmas Early Buddhist Theories on Existence*. Tokyo, The International Institute for Buddhist Studies, 1995.

2. Fukuda, Takumi. “Bhadanta Rama: A Sautrantika before Vasubandhu.” JIABS, Volume 26, November 2, 2003.

3. Halder, Aruna. *Some Psychological Aspect of Early Buddhist Philosophy based on Abhidharma kosa of Vasubandhu*. The Asiatic Society, Kolkata – 700016, 1981.

4. Keyt, Christine Mullikin. “Dharmakirtis concept of the Svalaksana”. Ph.D. diss., Washington University, 1980.

5. Louis De La Vallee Possin (Trans into French), Gelong Lodro Sangpo (Annoted English Translation). *Abhidharmakosa-Bhasya of Vasubandhu*. Volume I, Motilal Banarasidass Publishers, 2012.

6. Murti, T.R.V. *The Central Philosophy of Buddhism*. George Allen & Unwin Publishers, Great Britain, 1980.

7. Pandeya, Ramchandra. *The Pramanavarttikam of Acarya Dharmakirti*. Ed., Motilal Banarasidass Publishers, Delhi, 1989.

8. Prasad, H.S. *Essays on Time in Buddhism*. Sri Satguru Publications, Delhi, 1991.

9. Sinha, Braj M. *Time and Temporality in Samkhya-yoga and Abhidharma Buddhism*. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi – 110055, 1983.

10. Stcherbatsky, TH. *Buddhist Logic*. Volume 1, Motilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1993.

11. Tachikawa, Musashi. Hino, Shoun and Wada, Toshihiro. *Three Mountains and Seven Rivers : Prof. Musashi Tachikawa's Felicitation*. Volume. Motilal Banarasidass Publishers, 2004.

12. Vincent, Sekhar. S.J. *Dharma in Early Brahmanic, Buddhist, and Jain Tradition*. Sri Satguru Publications, Delhi, First Edition, 2003.

13. Yogindrananda, Swami. The Pramanavarttikam of Acarya Dharmakirti. Chaukhambha Vidyabhavan, Varanasi, 2004.

14. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী। *থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম*। মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা — ৭০০০৭৩, ২০১৫।

15. চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা। *নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা*। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা — ৭০০০৩২, ১৪২২ (ইং ২০১৫)।

16. ভট্টাচার্য্য, অনন্তকুমার। *বৈভাষিক দর্শন*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা — ১২।

17. সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার। *ন্যায়বিন্দু* (আচার্য ধর্মোত্তরের টীকাসহ)। কলকাতা — ৭০০০০৬, ২০০৭।

STATE LEVEL SEMINAR

ON

RELEVANCE OF PHILOSOPHY IN MODERN SOCIETY : DEBATE AND CHALLENGE

5th April, 2019

Organised by :

Dept. of Philosophy
Egra S.S.B. College
Egra, Purba Medinipur

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Mrs./Miss. SMRITA MUKHERJEE

of JADAVPUR UNIVERSITY *attended the one day State Level Seminar on* **"RELEVANCE OF PHILOSOPHY IN MODERN SOCIETY : DEBATE AND CHALLENGE",** *Organised by The Department of Philosophy, Egra S.S.B. College, Purba Medinipur. He / She presented a paper entitled*

BOUDHA DARSHANE SWATTAR LAKSHANER KRAMABIBARTAN

Moumita Das
Moumita Das
Joint Secretary
Seminar Organising Committee
Egra S. S. B. College

Indrani Majhi (Shit)
Indrani Majhi (Shit)
Joint Secretary
Seminar Organising Committee
Egra S. S. B. College

Dr. Dipak Kumar Tamili
Principal
President, Seminar Organising Committee
Egra S. S. B. College